শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরীর

নিদর্শন।

ঢাকা—বাঙ্গালা-যন্ত্রালয়,

প্রিণ্টার শ্রীমদনমোহন বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১। ১২ই শ্রাবণ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

সৃষ্টি-রহস্য।

অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি শব্দে যে পরাৎপর ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হয়, তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ং, সর্ব্বস্বরূপ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। একং-মেবাদ্বিতীয়ং শব্দের অর্থ এই যে, তিনি একমাত্র পদার্থ,—দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই। তিনি একাই সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হয়। তিনি একাই আমি, তুমি, সমস্ত-মনুষ্য, সমস্ত পশু, সমস্ত পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা; সাগর, পর্ব্বত, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—সকল প্রকার সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম সর্ব্বস্বরূপ। তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি নামেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; এই নামত্রয় হইতে এই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যতীত এমন একটু স্থান বা অবকাশ নাই যে, তাহাতে অন্য কোন বস্তুর কল্পনা করা যাইতে পারে। তিনি ভিন্ন অপর কিছু নাই, সুতরাং আমাদের বাক্য, চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, কার্য্য প্রভৃতিও তিনি। তিনি একাই সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন। কিরূপে পরিণত হইলেন, তাহাই সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনীয় বিষয়।

এক পদার্থ কিরূপে বহুপদার্থরূপে পরিণত হয়, তাহা অনেকেরই জিজ্ঞাস্য. কিন্তু যাঁহার প্রতি সর্ব্বশক্তিমত্তাদি অলৌকিক ভাবসমূহ প্রযুক্ত হয়, তিনি একা এ অনন্ত পদার্থনিচররূপে পরিণত হইতে পারেন না, ইহা বলিলে নিতান্তই অনুচিত হয়। আর, এক পদার্থ যে বিভিন্নরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধিৎসুগণের প্রত্যক্ষ ঘটনা। শ্বেতবর্ণ পারদ পীতবর্ণ গন্ধকসহ মিশিয়া গভীর কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী এবং গভীর রক্তবর্ণ হিঙ্গুলে পরিণত হয়, ইহা অনেকেই জানেন। বৈজ্ঞানিকেরা নিরূপণ করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার মাল হীরক ও অতি তুচ্ছ অঙ্গার, উভয়ই এক পদার্থ। শ্বেতসার ও চিনি—উভয় পদার্থই ঠিক সমান পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অঙ্গার মিশ্রণে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু উভয় পদার্থে কোনই সাদৃশ্য নাই একটি বিস্বাদ, অন্যটি সুমিষ্ট, একটি জমাট বান্ধা—মসৃণ, অন্যটি কচকচা দানা বিশিষ্ট; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—যে পঞ্চ উপায়ে, পদার্থগণকে অবগত হওয়া যায়, তাহার কোনটি দ্বারা ঐ উভয় পদার্থের একত্ব উপলব্ধি হয় না। ইহা দেখিয়াই ইউরোপের দার্শনিক শিরোমণি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, "যখন পদার্থের পার্থক্য না থাকিলেও কেবল সাজিবার কৌশলে এক পদার্থকে বহুরূপে পরিলক্ষিত হয়, তখন জগতের সমস্ত পদার্থ যে একমাত্র পদার্থের বিভিন্নরূপ সজ্জাবশতঃ বিভিন্নতা প্রাপ্ত, তাহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা দেখা যায় না।" তিনি বৈজ্ঞানিকগণের পরিজ্ঞেয় সমস্ত পদার্থের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াই ঐ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও

দেখাইয়াছেন; এতকাল বৈজ্ঞানিকেরা ৬৪ বা ৬৫ পদার্থের আবিষ্কার করিয়া মনে করিতেন, ইহারাই জগতের মূল উপাদান। এই উপাদান গুলির মধ্যে লৌহও একটি। এই লৌহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা হইতে ৮০ প্রকার বর্ণ নিষ্কাশিত হয়। যদি লৌহ একমাত্র পদার্থ হইত, তবে তাহার একাধিক বর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল; বস্তুতঃ লৌহ এক নয়, আশী প্রকার উপাদানে গঠিত বলিয়াই আশী প্রকার বর্ণ বিকাশিত করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, লৌহ পরমাণুকে আশী প্রকারে বিভক্ত করিতে পারেন। একমাত্র বিদ্যুৎশক্তি কখনও প্রবল আকর্ষণের কাজ—চুম্বকের কাজ করিতেছে, কখনও বিয়োজনের কাজ করিতেছে; কখনও ভারিত্ব প্রকাশ করিতেছে, কখনও লঘু হইয়া উড্ডীয়মান হইতেছে; এক পদার্থ যখন এরূপ বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে; তখন একই পদার্থই জগতের সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয়।

আর্য্যের একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব ম্লেচ্ছ স্পেন্সার এখনও প্রাপ্ত হন নাই; আর্য্যের "সর্ব্বভূতেষু আত্মনি" জ্ঞানের অভিপ্রায় তিনি জানেন না; কোন স্বধর্ম্মজ্ঞ হিন্দু এপর্য্যন্ত তাঁহাকে তাহা জানায় নাই; ভৌতিক জগৎভিন্ন আধ্যাত্মিক জগৎ যে আর একটা আছে,—ম্লেচ্ছ দার্শনিকের মতিগতি এপর্য্যন্ত সে দিকেই প্রবাহিত হয় নাই; তথাপি এই ভৌতিক জগতের অনুসন্ধান করিতে করিতেই যে তিনি ঐ গভীর সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই।

হিন্দু কি জন্য গাছ পাথর মাটি প্রভৃতি সর্ব্বভূতের পূজা করে, এ গভীর রহস্য তাঁহার মত দার্শনিক শিরোমণিকে বুঝান অতি সহজ হইয়াছে দেখিয়া, অবিলম্বেই বিদ্বৎ সমাজে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হওয়ার আশায় আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি। আমরা ক্রমে যে-সৃষ্টি, দেবতা ও ধর্ম্ম-রহস্যাদি প্রচার করিব, শিক্ষিত সমাজ যদি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরম প্রজ্ঞাবান্ হিন্দু হইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মই যে একমাত্র ধর্ম্ম ; হিন্দুত্ব ভিন্ন যে মনুষ্যত্ব তিষ্ঠিতে পারে না, ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্ব-অনভিজ্ঞতাজনিত অনুশোচনার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

সৃষ্টি-রহস্য। (২)

একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মই সকল পদার্থ রূপে পরিণত হইয়াছেন, এবং এই পরিণতি যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনেরও অনুমোদিত, তাহা গতবার প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সেই এক মাত্র পদার্থ কিরূপ ক্রমাবলম্বন করিয়া জগতের অনন্ত পদার্থে পরিণত হইলেন।

যখন তিনি একাকীই ছিলেন, আর কিছু ছিল না, সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্য ছিল না, কোন শক্তির বিকাশ ছিল না, তাঁহার তখনকার অবস্থা নির্গুণ শব্দের প্রতিপাদ্য। মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি প্রাণীগণ যেমন কার্য্যান্তে নিদ্রিত হয়, নিদ্রাকালে তাহাদের কোন ক্ষমতার বিকাশ থাকে না, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের উপাদান সেই পরব্রহ্ম পূর্ব্ববারের সৃষ্টি

প্রলয়াদি কার্য্যান্তে যেন নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত অনন্ত শয্যায় শয়ন কথাটী এই অবস্থা স্মরণ করিয়া হইয়াছে।

নিদ্রাকালে কোন কার্য্য থাকে না; তখন শক্তি যাপ্য থাকেন; নিদ্রা ভাঙ্গিবার প্রাক্কালেই শক্তির স্ফুরণ হয়. লোক গা মোড়ামুড়ি দেয়, স্বপ্ন দেখে, এইরূপে শক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তিই শেষে সমস্ত কার্য্য করেন। শক্তি ও ব্যক্তি যদিও পৃথক পদার্থ নহে, যদিও শক্তি ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য নাই, এবং ব্যক্তি ভিন্নও শক্তির বিকাশ নাই, তথাপি দুইটির পৃথক অস্তিত্ব বিবেচিত হয়। শক্তির অভাব অনেক সময়ে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ব্যক্তির অভাব হয় না। অতএব দুইটিকে পৃথক না বলা যাইবে কেন? বস্তুতঃ এই কারণেই ব্রহ্মহইতে তাঁহার যোগমায়ানাম্নী আদ্যাশক্তিকে পৃথক বলা হয়; কিন্তু এরূপ পার্থক্য দ্বারা ব্রহ্মের একমেবা-দ্বিতীয়ং নামে দোষ অর্শে না। আমার শক্তির সঙ্গে আমার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যখন লোকে আমাকে এক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, তখন শক্তিসম্বলিত ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ং না বলা যাইবে কেন?

নিদ্রা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে শক্তির বিকাশ হয়; সেই শক্তি হইতে চৈতন্য জন্মে; ব্রহ্মের এই চৈতন্য "মহৎ" নামে অভিহিত। চেতনাবস্থা ভিন্ন কোন ব্যক্তির পুরুষকার প্রকাশ পায় না, অন্যের প্রতি কর্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব করা ঘটে না; অত-এব এই চৈতন্য বা মহৎই ঈশ্বর নামে অভিহিত। জগতে এই ঈশ্বরেরই পূজা হয়। চেতনালাভ হইলে শেষে নিজকে অন্য হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞান জন্মে। অন্য হইতে নিজকে

পৃথক যদ্দ্বারা ভাবা হয়, সেই পদার্থের নাম অহঙ্কার। ব্রহ্মের এই অহঙ্কার সঙ্কর্ষণ দেব নামেও খ্যাত, এবং জগৎব্যাপী আকর্ষণ শক্তি এই সঙ্কর্ষণ দেবের কার্য্য। অহঙ্কার হইলেই পার্থক্য ভাবের অনুরোধে পৃথক্ পদার্থের আবশ্যকতা বিবেচনার সঙ্গে মনের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মের মন অনিরুদ্ধ নামেও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের সেই সদ্যপ্রসূত মন হইতে প্রথমতঃ শব্দের ও আকাশের উৎপত্তি হয়; শব্দ গুণবিশিষ্ট আকাশের কতকাংশে স্পর্শগুণ সম্বলিত বায়ু পরমাণুব উৎপত্তি হয়; বায়ুব কতকাংশে রূপবিশিষ্ট তেজের পরমাণু জন্মে; তেজের কতকাংশে রস সম্বলিত জলের উৎপত্তি হয়, জলের কতকাংশে গন্ধ সম্বলিত ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরোক্ত ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম গুলির নামে নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আপত্তি একটু সংক্ষেপে ভঞ্জন করা যাইতেছে। তাঁহারা শূন্য ও তেজের পদার্থত্ব স্বীকার করেন না, এবং বায়ু জল ও ক্ষিতিকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। শূন্য ও তেজের পদার্থত্ব অস্বীকারের কোন যুক্তি আমরা পাই না। যাহা যে কোনরূপে প্রকাশ পায় তাহাই পদার্থ। বায়ু ও জলাদি কোন পাত্র হইতে নিষ্কাশিত করিলে যাহা থাকে, তাহাই শূন্য। বায়ুকে চাপিলে সঙ্কুচিত হয় কেন? বায়ুর জাতীয়াকর্ষণ আছে, তথাপি বায়ুর পরমাণুগণ স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পরে সংযত না হইয়া কোন্ পদার্থের প্রবল পরাক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়? শূন্য যদি আপন বলে বায়ু মধ্যে প্রবেশ না করিত, তবে জাতীয়াকর্ষণ প্রভাবে বায়ুকে নিশ্চয়ই যন্ত্রদ্বারা সঙ্কুচিত অবস্থার ন্যায়

ঘনীভূত হইয়া থাকিতে হইত। অতএব এতদ্দ্বারা শূন্য ও তাহার বলের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহার এতাদৃশ বল, সে কোন পদার্থ নহে—এওকি একটা যুক্তি? শূন্যের বল দেখান হইল, শূন্যের শব্দ শক্তিও দেখান যাইতে পারে। বিশুদ্ধ শূন্যের শব্দ গ্রহণ করিবার অধিকার আমাদের নাই। যাহার যে গুণ নাই, সে অন্যের সেরূপ গুণ গ্রহণ করিতে পারে না; সদৃশ গুণ হইলেই গ্রহণ করিতে পারে। চক্ষুতে তেজ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়াই অন্য তৈজস পদার্থ দেখিতে পায়। রসনায় রস থাকাতেই অন্য পদার্থের রস গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই যে গুণ যাহাতে অধিক সেই গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ অমিশ্র পদার্থ নহে, সুতরাং অমিশ্র পদার্থের গুণ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। এই হেতু সর্ব্বগন্ধের আধার ক্ষিতিতে কোনই গন্ধ পায় না; সর্ব্ব রসের আধার জলে কোনই রস পায় না; সর্ব্ববর্ণের আধার শুক্লবর্ণে কোন বর্ণপ্রাপ্ত হয় না; এই কারণে খাটি শূন্য হইতেও শব্দের উপলব্ধি হয় না। একটি পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিলে সে পাত্রে কোনই শব্দ পাইবে না; কিন্তু সেই শূন্যগর্ভ পাত্রে ২। ৪ ফোটা জল দিয়া নাড়িয়া দেখ, সেই জল কাঁসের মত ঠনঠন করিয়া বাজিবে। অমিশ্র বলিয়া যে শূন্যের শব্দগুণ প্রকাশ পায় নাই, কিঞ্চিৎ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়াতে তাহার সেই শব্দ-গুণ প্রকটিত হইতেছে। এই শব্দগুণ যদি শূন্যের না হইয়া বায়ুপ্রভৃতি অন্য কোন পদার্থের হইত, তবে বায়ু প্রভৃ-তিতেই জলের ঐরূপ শব্দ হইত; কিন্তু শূন্য ব্যতীত অপর

কোন পদার্থে কি ২। ৪ ফোটা জলের ঐরূপ শব্দ করিবার ক্ষমতা কখনও হয়? নভোমণ্ডলে বায়ুর অল্পতা সুতরাং শূন্যের আধিক্য হেতু মেঘে মেঘে আঘাত লাগিয়া যেরূপ গভীর শব্দ হয়, শূন্যের অল্পতাবিশিষ্ট কোন স্থানে কোন উপায়ে কি সেরূপ শব্দ করান যাইতে পারে?

তেজের পদার্থত্ব অস্বীকার এক অপূর্ব্ব যুক্তি! তেজের রূপ আছে; দাহিকাশক্তি আছে, গতি আছে, গতির ক্রম আছে, কিন্তু তেজ বলিয়া একটা পদার্থ নাই? তেজ যদি একটা পদার্থ না হইত, তবে সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিতে এতবিলম্ব কাহার হয়? পাশ্চাত্যগণের এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণ এই যে তাঁহারা এপর্য্যন্ত যে ৬৫ মূল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কোনটাই স্বরূপতঃ তেজ নহে, অথচ তাহার প্রায় সকলটাতেই তেজের উপলব্ধি হয়। ইহা দেখিয়াই তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তেজ নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা সমস্ত পদার্থেরই একটা বিশেষ গুণ। বস্তুতঃ তাঁহারা যে ৬৫ পদার্থকে মূল পদার্থ মনন করিয়া ঐরূপ মীমাংসা করেন, তাহাদের মূলত্ব সম্বন্ধেই বিষম গোলযোগ। ঐ পদার্থ গুলি যে মূল পদার্থ নহে,—মিশ্র পদার্থ, তাহা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় বৈজ্ঞানিক চূড়ামণিদিগকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। পদার্থকে সূক্ষ্মতম অংশে ভাগ করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই, তাহাও স্পেন্সার প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যে ৬৫টিকে মূল পদার্থ বলা হয়, তাহা যে তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় নাই তাহা কে বলিবে?। শাস্ত্রে যে পঞ্চভূতের কথা,

আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ মাটি, জল, তেজাদি নহে। শাস্ত্রে পুনঃ পুনই বলা হইয়াছে, কোন পদার্থই অমিশ্রাবস্থায় নাই; সকলেই অন্যান্যের সঙ্গে মিলিয়া থাকে; কিন্তু যে পদার্থের নামে যে-পদার্থ পরিচিত, সেই পদার্থের অংশ সেই পদার্থে অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক থাকে বটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে;—যাহাকে জল বলা হয়, তাহা অপ্ জাতীয় পরমাণুর সংখ্যা অর্দ্ধেক ও অন্য ভূত চতুষ্টয়ের পরমাণু অর্দ্ধেক সহ মিশিয়া গঠিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রমতে একটি জলেই পাঁচটি পদার্থ আছে; নব্য বৈজ্ঞানিকেরা জলকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়া কি বড় বাহাদুরি করিয়াছেন? ইন্দ্র বায়ুকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; সেই উনপঞ্চাশ জাতীয় অণুবিশিষ্ট বায়ু যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তবে তাহাতে বায়ুত্ব লোপের কি আছে?

পরমাণু কত সূক্ষ্ম, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রগ্রাহ্য কীটাণুর ইন্দ্রিয় পাকযন্ত্র ও জরায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্মতম অংশসকলসম্বলিত অবয়ব গঠনে যে লক্ষ লক্ষ পরমাণু প্রযুক্ত হয় তাহার সূক্ষ্মতা স্থির করা অসম্ভব। কোন যন্ত্রদ্বারা সেই পরমাণুদিগকে আবদ্ধ করা যাইতে পারে না, যেহেতু যন্ত্রের উপাদান ধাতু কাচ প্রভৃতিতে এমন সূক্ষ্মতম ছিদ্র থাকিবেই যদ্দ্বারা পরমাণু বহির্গত হইয়া যায়। প্রাণীর প্রাণবায়ুকে কখনও কি কেহ যন্ত্রদ্বারা আটকাইতে সমর্থ হইয়াছে? এই সূক্ষ্মতম পরমাণুগণ কখনও স্বতন্ত্র থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা নিকটবর্ত্তী পরমাণুগণ সহ মিলিয়া অপেক্ষাকৃত একটু বড়, "অণু" রূপে পরিণত হয়। বড় হইলেই

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রের উপরে আধিপত্য করিবার ক্ষমতা জন্মে. এই হেতু প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুই নিকটবর্ত্তী অন্যান্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বড় হইবার চেষ্টা পাইতেছে। সেই চেষ্টাতে অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও বিরোধও হইতেছে। পরমাণুগণের ও সূক্ষ্ম অণুগণের এইরূপ মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার অণু গঠিত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। পরমাণু ও অণুগণের চেষ্টা অথবা বিরোধের কথা হয় ত অনেকের নিকট পরিহাসজনক বোধ হইবে। অনেকের বিবেচনায় ইহারা জড়পদার্থ,—ইহাদের আবার একটা চেষ্টা কি ?

বস্তুতঃ জড়শব্দ এখন যে অর্থে ব্যবহৃত হয়. তাহা অযুক্ত। পূর্ব্বেও জড়শব্দ ছিল ; পরম প্রজ্ঞাবান্ ভরত—জড়ভরত নামে অভিহিত হইতেন। জড়শব্দ তখন অলস অর্থের প্রতি: পাদক ছিল। এখনও জাড্য ও আলস্য একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং জড় অর্থে আত্মাহীন বুঝায় না ;—জড় ভরত কি আত্মাহীন ছিলেন ? কিন্তু এখন অনেকেই বুঝেন—এমন কি, কোন কোন দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যাতারাও বুঝাইয়াছেন, জড় ও আত্মা পৃথক পদার্থ। এরূপ বুঝিবার কোন কারণ দেখি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা পরব্রহ্মই এই সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্ট কোন পদার্থ হইতেই পারে না। পিতার পুত্রটি যেমন পিতার আকৃতি প্রকৃতি, অনেক অংশে প্রাপ্ত হয়, অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্যোপযুক্ত একটা বিশেষ আকৃতি প্রকৃতিও লাভ করে; তদ্রূপ শক্তিমান্ ব্রহ্ম

হইতে চৈতন্য, চৈতন্য হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন, মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হওয়াতে ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশেষ গুণের সহিত পৈতৃক পৈতামহিক গুণের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এই জন্য ক্ষিতি পরমাণুতে নিজের বিশেষ গুণ গন্ধের সহিত জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ, ব্যোমের শব্দ মনের মনস্বিতা, অহঙ্কারের স্বাতন্ত্র্যভাব ও আকর্ষণ, চৈতন্যের চেতনা ও ঈশ্বরত্ব এবং পরমাত্মার ক্ষিতিসমাচ্ছন্ন অংশ ও শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে; জলীয় পরমাণুতে পৃথিবীর গন্ধ ব্যতীত উল্লিখিত সমস্ত গুলি গুণই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; এইরূপ অন্যান্য পদার্থগণেও আপনাপন বিশেষ গুণের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের গুণগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আত্মা চৈতন্য ও চেষ্টা শক্তি বিহীন কোন পদার্থ থাকার অনুমান, যুক্তি ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। তবে কোন কোন পদার্থের যে স্বাধীন চেষ্টার কোন কার্য্য আমরা দেখিতে পাইনা, তাহা কতকটা মনুষ্যের অধিকারের বাহিরে বলিয়া, কতকটা সেই পদার্থের সুবিধার অভাব বলিয়া হয়। ক্ষুদ্র পরমাণু অথবা আকাশের জ্যোতিষ্ক কোন্ কাজ করিতেছে, তাহা আমাদের দেখিবার বা বুঝিবার কোনই অধিকার নাই। যদি কোন বুদ্ধিমান মানবের সকলগুলি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া ফেলিয়া রাখ, তবে তাহার মাথাভরা বুদ্ধি যেমন কোন কাজে লাগে না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত গাছ পাথরাদিও কোন কাজ করিতে পারে না; ইহাই কি তাহাদের জড়ত্ব বা আত্মা না থাকার প্রমাণ ?

প্রত্যেক পদার্থেরই যে স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, বহুদিন পূর্ব্বে আমরা তাহার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি।

সৃষ্টি-রহস্য। (৩)

দ্বিতীয় প্রবন্ধে যে সকল মূল পদার্থের উৎপত্তির উল্লেখ করা গিয়াছে ঐ পদার্থগণ সম্বলিত সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ পরস্পরে স্বস্ব নিকটবর্ত্তী পরমাণুগণসহ মিলিয়া মিলিয়া অণু বা কণা (শাস্ত্রোক্ত স্থূল পরমাণু) নামোপাহিত অবয়বে পরিণত হয়। এ অবয়বও এত ক্ষুদ্র যে মনুষ্য অণুবীক্ষণ সাহায্যেও তাহা দেখিতে পায় না। পরমাণুগণের একত্র অবস্থানের তারতম্যে অণুগণ অসংখ্য প্রকার হইয়াছে। সেই অসংখ্য প্রকার অণুগণ মধ্যে কয়েকটী দেবতা অথবা ইন্দ্রিয় নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ইন্দ্র নামক যে একপ্রকার অণু আছে, তাহা হস্ত গঠনে প্রযুক্ত হয়; ঐ ইন্দ্রাণুগণের কার্য্যশক্তি বিদ্যুৎনামে অভিহিত। অন্য এক প্রকার অণুর নাম উপেন্দ্র; এতদ্দ্বারা পদ গঠিত হয়। অন্য কতকগুলি অণু সূর্য্য নামে অভিহিত, তদ্দ্বারা চক্ষু হয়। এইরূপ প্রজাপতি নামক অণুদ্বারা উপস্থ, পুষা দ্বারা পায়ু, বায়ু দ্বারা চর্ম্ম, জল দ্বারা জিহ্বা, শূন্য দ্বারা কর্ণ ও ক্ষিতি দ্বারা নাসিকা গঠিত হয়। এই বায়ু জল শূন্য ও ক্ষিতি নামক অণুগণ অমিশ্র নহে—মিশ্র, অথচ স্বনামধেয় পরমাণুর আধিক্যে গঠিত।

এই সমস্ত পরমাণু প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একটি অব-

য়বে পরিণত হয়। শাস্ত্রে সেই অবয়বকে "বিরাট পুরুষ" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ঐ বিরাট পুরুষে অবস্থিত ইন্দ্রাদি নামধেয় ইন্দ্রিয়গণ নানাদিকে স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ স্ফুরিত হওয়াতে সেই বিরাট অবয়ব হইতে অসংখ্য হস্ত অসংখ্য পদ, ও অসংখ্য চক্ষু-কর্ণাদি-সম্বলিত-মস্তক গঠিত হয়। অতঃপর সেই বিরাটপুরুষরূপী-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সঙ্কর্ষণ দেবের স্বভাবানুসারে অণুগণ আকর্ষিত হইয়া "ব্রহ্মা" নামে একটি সুবৃহৎ অবয়বে পরিণত হয়; এই ব্রহ্মা কোটি কোটি বর্ষ সেই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকেন। সদ্যপ্রসূত বালক যেমন কিছু বুঝে না, ব্রহ্মা তদ্রূপ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় কেবল ঘুরিতে ছিলেন। এমন সময়ে বিরাট পুরুষ হইতে দুইটি অংশ খসিয়া ব্রহ্মার দিকে ধাবিত হয়। সেই অংশদ্বয় মধু ও কৈটভ নামে অভিহিত। তাহারা ব্রহ্মার দিকে আসিয়া ব্রহ্মার অঙ্গে ঠেকে। ইহাতে ঘাত প্রতিঘাত বা ঠোকা ঠুকি আরম্ভ হয়। যেমন মনুষ্য শিশু জন্মিবার পরে পিপীলিকা জন্মলাভ করতঃ মনুষ্য শিশুর পূর্ব্বেই কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে, তদ্রূপ ব্রহ্মার পরে জন্মিলেও মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে প্রপীড়িত করিতে সমধিক কৃতকার্য্য হয়। তাহাদের পীড়নে ব্রহ্মা শিশুর ন্যায় রোদন করিতে থাকেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। যেমন চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর একপ্রান্তে জোয়ার হইলে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও জোয়ার হয়,—মধ্যবর্ত্তী জল যেন দুই দিকে সরিয়া যায়, তদ্রূপ মধ্যবর্ত্তী অণুগণ ব্রহ্মার অবয়বে পরিণত-হওয়াতে মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি ব্রহ্মা ও মধুকৈটভে প্রযুক্ত হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের

বা বিরাটপুরুষের বাহ্যদিকে শক্তি বিশেষরূপে প্রকটিতা হন। তদ্দ্বারা বিরাট পুরুষের বাহ্য অবয়ব যেন বিগত-নিদ্র ব্যক্তির ন্যায় প্রবুদ্ধ হয়। তখন তিনি ব্রহ্মার সেই কষ্ট অপনোদন জন্য মধুকৈটভকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করতঃ তাহাদিগ হইতে প্রাণ বায়ু ও তেজ চুষিয়া লওয়াতে তাহারা হত হয়। তাহাদের উভয়ের প্রাণ ও তেজহীন দেহ একত্র সংযত হইয়া মেদিনীরূপে পরিণত হয়। মধুকৈটভের মেদ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে পৃথিবীর নাম মেদিনী; ভগবতী পরমাশক্তি মধু-কৈটভকে বিনাশ নিমিত্ত বিরাট পুরুষে যে বিচিত্ররূপে প্রকটিতা হন, এজন্য তাঁহার নামান্তর মধুকৈটভ নাশিনী, এবং ভগবান বিরাটপুরুষ মধুকৈটভকে বিনাশ করাতে মধুসূদন ও কৈটভারি নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

মধুকৈটভের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং নিজেদের বড় হইবার ইচ্ছাতেও ব্রহ্মার অবয়বস্থ বহুবিধ অণু পরস্পরে সংযত হইয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় অনেকগুলি অণু গঠিত হয়। তন্মধ্যে মনু, ধাতা, বিধাতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রভৃতি কয়েক প্রকার অণু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ব্রহ্মার দেহাবস্থিত মনু নামক মনস্বিতা প্রধান অণুগণই ধাতা ও বিধাতা নামক অণুগণসহ মিলিয়া মরীচি, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত, অত্রি, বসিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ নামক দশটি অবয়ব গঠন করেন। ব্রহ্মার ঘূর্ণাবেগে তাঁহার অবয়বের সেই দশ অংশ স্খলিত হইয়া বিভিন্ন দিকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক ঘুরিতে থাকেন। উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিনামক যে সাতটি নক্ষত্রকে খুব নিকটে নিকটে পরিলক্ষিত হয়; তাঁহারাই ব্রহ্মার অবয়ব-স্খলিত

মরীচ্যাদি প্রথমোক্ত সপ্ত মহাপুরুষ। আমরা যে দিক্‌কে দক্ষিণ বলিয়া লক্ষ্য করি ঐদিকে বহুদূরে দক্ষ নামে একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবস্থান করিতেছেন। ভৃগুও জ্যোতিষ্করূপে ঊর্দ্ধ আকাশে অবস্থান করিতেছেন; নারদ কোথায় কথন থাকেন, নির্দ্দিষ্ট নাই। মরীচির অঙ্গ-স্খলিত হইয়া যে সকল অণু সুবিস্তৃত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কশ্যপ নামে অভিহিত হয়। এই কশ্যপ হইতেই ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক জ্যোতিষ্ক এবং পার্থিব পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদি বহু পদার্থের বীজীপুরুষ উৎপন্ন হয়; আমরা বারান্তরে সুবিস্তৃত কশ্যপ বংশের আলোচনা করিব। অঙ্গিরা ব্রহ্মার দ্বিতীয় অঙ্গজ; ইহাঁর শরীর হইতে তিনটি অংশ স্খলিত হয়, তন্মধ্যে বৃহস্পতিকে সকলেই গ্রহরূপে দেখিয়া থাকেন। অঙ্গিরার অপর অংশদ্বয় সম্বর্ত্ত ও উতথ্য নামে খ্যাত; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে চিনি না; সম্ভবতঃ বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে যে পাঁচটি উপগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তাহাঁর দুইটি তাঁহার দুই ভ্রাতা ও অপর তিনটি তাঁহার তিন পুত্র। উতথ্যের দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ পুত্র ছিলেন; ন্যায়দর্শন কর্ত্তা গৌতমঋষি সেই অন্ধ দীর্ঘতমার পুত্র। দীর্ঘতমার ঔরষে বলিরাজার ভার্য্যা-গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে যে পাঁচ পুত্র জন্মে, তাহাদের রাজ্য বলিয়াই বঙ্গাদি দেশের নাম হয়। সুতরাং গ্রহরূপী বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র দীর্ঘতমা যে একটী মনুষ্য বংশের আদি পুরুষ, তাহা ইতিহাস ও বঙ্গাদি দেশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

চন্দ্র যদিও পরে পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া-

ছেন ; (এবং এই মত নব্য বিজ্ঞানের সম্মত.) কিন্তু উহা ভগবান্ ব্রহ্মার ষষ্ঠপুত্র অত্রিঋষি হইতে স্খলিত ও সমুদ্রে পতিত এক অংশ বিশেষ। বুধগ্রহ এই চন্দ্রের পুত্র। বর্ত্তমানকালে বুধ চন্দ্র হইতে বহু ব্যবধানে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে উহাকে নব্যবৈজ্ঞানিকগণ সূর্য্য হইতে স্খলিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন বটে. বস্তুতঃ যে কালে শাস্ত্রে বুধকে চন্দ্রের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বুধকে চন্দ্রের পুত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার বিশেষ কারণ অবশ্যই ছিল ; নতুবা আকাশ ভরা তারা থাকিতে বুধকে চন্দ্রের পুত্র বলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বহুকালে নক্ষত্রগণ যে বহুদূর দূরান্তরে গমন করিয়া থাকেন, তাহা পঞ্জিকাবিভ্রাটের কারণানুসন্ধানেই প্রতিপন্ন হয়। বুধ এমনকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন. যখন বৃহস্পতিও তাঁহাকে পুত্ররূপে দাওয়া করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। বুধ হইতে চন্দ্রবংশ নামে ঐতিহাসিক বহু রাজকুল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপ বহুসংখ্যক মনুষ্য বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চন্দ্র ভিন্ন অত্রির আরও অসংখ্য সন্তান হইয়াছিলেন ; তাঁহারা কেহ কেহ হয়তঃ এখনও জ্যোতিষ্ক রূপে নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্য লোকে তাঁহারা পরিচিত নহেন। ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র ক্রতু পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক ঋষিপুত্রের জনক হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমানে আমাদের পরিচিত তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বংশ নাই। ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র পুলহ হইতে শলভ সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র ভল্লুক ও কেন্দুয়া বাঘদিগের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন বর্ত্তমান না থাকিলেও পূর্ব্বকালে শলভ

নামে এমন পরাক্রমশালী এক প্রকার অষ্টপদ-বিশিষ্ট জন্তু ছিল, যাহার নিকটে সিংহকেও পরাভব মানিতে হইত। পঞ্চম পুলস্ত্য হইতে যক্ষ, রাক্ষস, বানর, ও কিন্নর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার সপ্তম পুত্র বশিষ্ঠই মহাভারত কর্ত্তা ব্যাসদেবের প্রপিতামহ এবং পূর্ব্বকালে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের পৌরোহিত্য কার্য্যে ইনি অনেক পাঠকের পরিচিত। ইহাঁর পত্নী অরুন্ধতী সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যেই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মার অন্যতম অংশ ভৃগুর পৌত্র শুক্রগ্রহ পাঠকের বিশেষ পরিচিত। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ইহাঁকে শুধু চক্ষে সকল তারা অপেক্ষা বড় দেখা যায়। ভৃগুর বংশ বলিয়া পূর্ব্বকালে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পরিচিত ছিলেন। দক্ষের যে অসংখ্য কন্যা ও পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে অতি উচ্চ আকাশ-ব্যাপিনী সাতাইশটী নক্ষত্র মণ্ডল আমাদের বিশেষ পরিচিত। নাম যদিও সাতাইশটি, তথাপি প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যেই অনেক গুলি করিয়া তারা বর্ত্তমান। প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যে তারা বহুসংখ্যক থাকা সত্বেও তাহাদের এক একটি করিয়া গুণ প্রকাশ পায়; অতএব প্রত্যেক নক্ষত্রের অন্তর্গত যত তারাই থাকুক না, তাহারা সকলে এক উপাদানে গঠিত বলিয়া বোধ হয়। সাতাইশ নক্ষত্রের ঐ সাতাইশ জাতীয় উপাদানই দক্ষ হইতে জন্মিয়াছে, এবং পরে সেই উপাদান গুলি স্বতন্ত্ররূপে সমবেত হইয়া বহুসংখ্যক তারার আকারে পরিণত হইয়াছে। দক্ষের আর যে তেরটি কন্যা কশ্যপের স্ত্রী বলিয়া আখ্যাত, তাঁহারাও তের প্রকার অণু। মরীচি হইতে খলিত যে অণু নিচয়

নভোমণ্ডলের অতি বিস্তীর্ণ প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া কশ্যপ নামে অভিহিত হয়, প্রজাপতি দক্ষের প্রসূতি নাম্নী প্রসব-কারিণী শক্তি হইতে উৎপন্ন তের প্রকার অণু সেই কশ্যপ উপাহিত প্রদেশের তের অংশে প্রবিষ্ট হইয়া কশ্যপকে তের প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট করেন। যে অংশ অদিতি নামক অণুগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। কশ্যপের দিতি প্রকৃতিবিশিষ্ট অংশ হইতে হিরণ্য কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল. ভগবান্ তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ, তৎ-পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র বাণ—ইহাঁরা সকলেই ঐতিহাসিক প্রধান ব্যক্তি। কশ্যপের দনু নামক অপরাংশ হইতে বহুসংখ্যক দানবের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার বিনতা নামক অংশ হইতে গরুড় পক্ষী ও গরুড় হইতেই কোন কোন জাতীয় পক্ষীর বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কদ্রু নামক কশ্যপের অপর প্রকৃতি হইতে বহুসংখ্যক বহুজাতীয় সর্প বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য যে সকল লোক যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে. তাহা আগামীতে প্রকাশ পাইবে। ও বৈজ্ঞানিক সন্দেহ গুলি সংক্ষেপে ভঞ্জন করা যাইবে।

সৃষ্টি-রহস্য। (৪)

পূর্ব্বে সূক্ষ্ম অণু সৃষ্টি প্রসঙ্গে ইন্দ্র উপেন্দ্রাদি যে সকল দেবতা বা ইন্দ্রিয় সৃষ্টির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের কোন কোন ইন্দ্রিয়াণুগণই বিরাট পুরুষ হইতে ব্রহ্মাতে, ব্রহ্মা হইতে মরীচিতে ও মরীচি হইতে কশ্যপে অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। যে কালে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদির উৎপত্তি হয় নাই, তখন কশ্যপই অতীব তেজস্বী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সেই কালে তাঁহাকে দ্যৌঃ বলা হইত, কখন কখন তিনি দ্যাবা শব্দেও পরিচিত হইতেন। পৃথিবীর উর্দ্ধতন জ্যোতির্ম্ময় আকাশ মণ্ডলকেই যে দ্যৌঃ, দ্যাবা, কশ্যপ প্রভৃতি নামে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা ঋক্‌বেদের কতকগুলি স্তোত্রেই প্রকাশ পায়। কিন্তু এই আকাশ যে সুধু আকাশ নহে, কতকগুলি অতীব ক্ষমতাপন্ন ও তেজস্বী অণু সমবায়ে পরিপূর্ণ, তাহা ঋক্‌বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। কোন পদার্থকে অবলম্বন না করিয়া যে সুধু আকাশ উজ্জ্বল হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। অদ্যাপি ধূমকেতুগুলিকে যেমন তরল অণু সমষ্টিতে সংগঠিত পরিলক্ষিত হয়, কেতুর পিতা কশ্যপও তখন তদ্রূপ তরল অণু সমূহে তদপেক্ষা সুবৃহৎ আকাশ মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদের নব্য অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাদিগের বিবেচনায় কশ্যপ সুধু আকাশ ও ক্ষমতাহীন রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন; সুতরাং এসম্বন্ধে এখানে গুটি কত কথা বলা আবশ্যক হই-

তেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই, অতএব আকাশ মণ্ডলের যতদূর কশ্যপ নামে অভিহিত, তাহাও আকাশরূপ বিশিষ্ট পরমাত্মার কতক অংশ। আকাশের যে প্রবল ক্ষমতা আছে, তাহা বায়ু জল প্রভৃতির জাতীয়াকর্ষণকে পরাভব করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকাতেই উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন মনুষ্যাদির উপাদান সমস্ত গুলিই যখন কশ্যপে অবস্থান করিতেছিল, তখন কশ্যপ যে ক্ষমতা সম্পন্ন নহেন, এ কথা কিরূপে বলা যায়?

এই কশ্যপে মরীচি হইতে সমাগত বিদ্যুৎ-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র নামক অণুগণ একত্র সংযত হইয়াই ইন্দ্র নামক একটি প্রকাণ্ড অবয়ব গঠিত হয়। এইরূপ ধাতা নামক অণুগণ সংযত হইয়া ধাতা, মিত্রাণুগণ মিত্র, অর্য্যামা অণুগণ অর্য্যামা, সূর্য্য অণুগণ সবিতা, উপেন্দ্র অণুগণ উপেন্দ্র বা বামন দেব, ইত্যাদি দেব গণের অবয়ব গুলি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সুধু এক জাতীয় অণুদ্বারা ঐ সকল অবয়ব গঠিত হইয়াছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন; অন্যান্য বহুজাতীয় অণুও সেই সকল অবয়বে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও সকল ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু যে জাতীয় অণুর ভাগ যে অবয়বে অধিক, সেই অবয়ব সেই অণুর নামেই অভিহিত। এস্থানে ভগবৎ ভক্ত-দিগের অনুরোধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, এই সকল অবয়ব যে যে আত্মাকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব; তবে উপেন্দ্র বা বামনদেবের সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁহার আত্মা পূর্ব্বোল্লিখিত ভগবান্ চৈতন্য অথবা মহত্তের এক

অংশ। আত্মা সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ আমরা বারান্তরে ভঞ্জন করিব। নব্যসমাজে, জগতে এতপ্রকার পদার্থ কিরূপে গঠিত হইল, এই প্রশ্নই প্রধান; আমরা তাহারই মীমাংসা অগ্রে করিব।

নভোমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্র তারা ও হরিতালিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত যতগুলি জ্যোতিষ্ক পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা সকলেই একরূপে উদ্ভূত হন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ অন্য কোন প্রকাণ্ড অবয়বীর সবেগ আবর্ত্তন অবস্থায় স্খলিত অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; কেহ কেহ অন্য অবয়বীর বীর্য্যরূপে স্খলিত হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত অণুগণ সংগ্রহ পূর্ব্বক পুষ্ট হইয়াছেন; সত্যাদি যুগের কোন কোন পার্থিব মনুষ্য যোগ, তপস্যা, যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য অথবা মহাপুরুষদিগের অনুগ্রহ প্রভাবে স্বর্গ বা নভোমণ্ডলের অন্যান্য অংশে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত অবয়বীগণ কেহ কেহ কঠিন অবস্থায় কেহ কেহ কতকাংশ তরল অবস্থায়, কেহ কেহ ধূমকেতুর ন্যায় শুধু তরল অবস্থায়, কেহ বায়ুর ন্যায় অলক্ষ্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন।

নব্যমতে জ্যোতিষ্কগণের উৎপত্তি একই প্রকারে অনুমিত হয়। এরূপ অনুমান শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিরুদ্ধ। কতকগুলি অবয়বের উৎপত্তি যে অন্যের স্খলিত অঙ্গাদি হইতে হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রেরই কথা; নব্য অনুমান সেই শাস্ত্রোক্তিরই পোষাকতা করিতেছেন। নব্য অনুমানকারিগণ জ্যোতিষ্কগণের দূরতা, বৃহত্তা ও আকর্ষণ অবলম্বন দ্বারা এইরূপ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান যে নির্ভুল নহে, তাহা

তাঁহারাও বলিতে পারেন না। তাঁহারা যে শত ২শত জ্যোতিষ্কের দূরত্বাদি নির্ণয় করিয়াছেন, কেবল তাহাদের উপরেই তাঁহাদের অনুমান কতকটা আরোপিত হইতে পারে, অন্যগুলির সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই। আর যে শত দুই শত জ্যোতিষ্ককে নিজেদের অনুমানের গণ্ডীতে আনিয়াছেন, তাহাও নির্ভুল নহে। তাঁহারা যে প্রণালীর গণনা দ্বারা দূরত্ব নিরূপণ করেন, তাহাতেও ভুল হইতে পারে। একটি নক্ষত্রের দূরত্ব নিরূপণে অপর একটি নক্ষত্রের দূরত্ব নিশ্চয়রূপে জানা আবশ্যক; সেই অপর নক্ষত্রটিকে এক কোণে স্থান দিয়া তাহার তুলনায় উদ্দিষ্ট নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়; কিন্তু সেই অপর নক্ষত্রটির দূরত্ব যে ঠিক, তাহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অবশ্য তাঁহাদের গণনানুসারে গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট করা যায়; কিন্তু তাহাতেই দূরতার নিশ্চয়তা হয় না। পাশ্চাত্য জ্যোতিষেই গ্রহদিগের দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু সকলের গণনাতেই গ্রহণাদি মিলিয়াছে। এদেশীয় জ্যোতিষে যে গ্রহের যে দূরত্ব নির্দ্ধারিত আছে, যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহাদির দূরত্ব তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক, তথাপি দেশীয় জ্যোতিষের গণনায় চিরকাল প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব পাশ্চাত্য জ্যোতিষের নির্দ্ধারিত গ্রহাদির দূরত্ব যে ঠিক, তাহা বলা যায় না। দূরত্ব ও আকর্ষণের বলাবল বুঝিয়া বৃহত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয়, কিন্তু যদি ঐ দুইটিতে ভুল থাকে, তবে এটিতেও ভুল হইতে

পারে। আকর্ষণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের বিভিন্নরূপ ; তদ্বারা কোন ক্রমেই অনির্দ্দিষ্ট উপাদান বিশিষ্ট পদার্থের পরিমাণ করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ জ্যোতিষ্কের গুণ ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে যে সকল অনুমান করিয়াছেন. তাহা যে ভ্রান্ত, তাহা সম্প্রতি সৌর জগতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ "অলগল" তারার আবিষ্কারেও প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব কোন্ জ্যোতিষ্ক হইতে কোন্ জ্যোতিষ্কের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আধুনিক লোকের কোন ক্রমেই জানিবার অধিকার নাই। তবে আধুনিক লোকের অনুমান সে স্থলেই স্বীকৃত হইবে ; যে স্থলে সেই অনুমান শাস্ত্রীয় প্রমাণের অনুকূল।

নব্যমতে সৌর জগতের সমস্তগুলি গ্রহই সূর্য্যের এক এক অংশ স্খলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয় ; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কেবল শনিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুমান ঠিক। শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি এ তত্ত্ব আমাদিগকে দিয়াছেন, তিনি যে অবৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান সমাজে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। যিনি সূর্য্য হইতে শনির উৎপত্তি আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সেই শাস্ত্রকারই আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও মঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে ; তন্মধ্যে কুজ (পৃথিবী জাত—মঙ্গল) স্বরূপতঃ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু সোম যদিও সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ কর্ত্তৃক সমূদ্রমন্থনকালে পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভ হইতে স্খলিত হইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন ; বস্তুতঃ চন্দ্র নামক ঐ অবয়বটী সেই সপ্তর্ষি মণ্ডলবর্ত্তী অত্রি ঋষি হইতে স্খলিত ও সমুদ্রে পতিত তাঁহার একটি চক্ষু মাত্র। আমাদিগের স্বাভা-

বিক চক্ষে যে অত্রিকে অতি ক্ষুদ্র একটি নক্ষত্র বলিয়া পরি-
লক্ষিত হয়, সেই অত্রির চক্ষুরূপ ক্ষুদ্রাংশে এত বড় একটি
চন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিবার উক্তি করায় অবৈজ্ঞানিক ও অন-
ভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহস হইতে পারে কিনা, এবং এমন ব্যক্তির
কথা অবৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ লোকসমূহ দ্বারা এত সুদীর্ঘ-
কাল যাবৎ মান্য হইয়া আসা সম্ভবপর কিনা, তাহাও বুদ্ধি-
মান্ পাঠকের বিবেচ্য। সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড পদার্থকে ক্ষুদ্রবৎ
লক্ষিত মরীচির অংশের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই কি
অবৈজ্ঞানিক অনভিজ্ঞের কার্য্য? অঙ্গিরার অংশে বৃহস্পতি
গ্রহ ও ভৃগুর অংশাংশে শুক্রগ্রহের উৎপত্তি যিনি নির্দ্ধারণ
করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম বৈজ্ঞানিক সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন।
তাঁহার সেই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে নব্য বৈজ্ঞানিকের অনুমান
যে গ্রাহ্য নহে, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই উপলব্ধি হয়।
নব্য বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যের অসাধারণ অফুরন্ত জ্যোতির
কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তথাপি সেই সূর্য্যকে
বত্রিশ পদার্থে গঠিত বলিয়া এবং পৃথিবীর মৃত্তিকাকে ১৩টী
পদার্থে গঠিত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞা
নের অনুমান এই যে সূর্য্যেরই কতকাংশ খসিয়া আসিয়া
এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। পাঠক ভাবিয়া দেখুন,
যে সূর্য্যের উপাদান ৩২ প্রকার তাহা হইতে অমনি খসিয়া
আসিলে পৃথিবীর উপাদান ১৩ প্রকার হয় কিরূপে? যে
সূর্য্য চিরস্থায়ী জ্যোতির আধার, তাহা হইতে খসিয়া আসিলে
পৃথিবী চিরদিন জ্যোতির ভিখারী কেন? যদি বলা হয়,
সূর্য্য জ্যোতিষ্মান পদার্থগুলিকে নিজে বাছিয়া রাখিয়া, যত

গয়দ্দা জিনিস তাহাই পৃথিবীর উপাদানে লাগাইয়াছিলেন ; তবে কিন্তু নব্যমতেও তাঁহাকে একটি বুদ্ধিমান লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অনুমানে আরও বাহাদুরি আছে। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, সকলেই সূর্য্যের এক একটী অংশ, কিন্তু ইহার কেহই জ্যোতির্ম্ময় নহেন। বলা হয়, তেজ বলিয়া একটা ভিন্ন জিনিষ নাই,—সকল জিনিসেরই তেজ একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু যে সকল জিনিস সূর্য্যে আছে, সেই সকল জিনিস পৃথিব্যাদিতেও আছে ; তবে যে সকল জিনিস সূর্য্যে থাকিয়া জ্বলিতে পারে, তাহা পৃথিব্যাদিতে জ্বলে না কেন ? যদি বলা হয়, সূর্য্য অদ্যাপি পৃথিব্যাদির ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহা জ্বলিতেছে, তবে সূর্য্য অপেক্ষাও যে তরল ধূমকেতু, তাহা সূর্য্যাপেক্ষা অধিক জ্বলেনা কেন ? বলা হয়, "সূর্য্যে ফস্ফরাস, ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি জ্বলনশীল পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে ; অন্যগুলিতে তাহা নাই।" মঙ্গলের রক্তবর্ণ বৃহস্পতির স্বর্ণবর্ণ, শুক্রের শুভ্রবর্ণ, বুধের শ্যামবর্ণ শনির কৃষ্ণবর্ণ—এই সকল বর্ণ হইতে অবশ্যই বিভিন্ন রূপ উপাদানের প্রয়োজন। এই সকল বর্ণ যে যে উপাদানে হয়, তাহাই কিন্তু সূর্য্যের সম্বল ; তবে তাহা সূর্য্যে থাকিলে জ্বলিবে, অন্যত্র জ্বলিবে না কেন ? যে হউক সূর্য্য হইতে এই সকল গ্রহ বিভক্ত হইয়া থাকিলে সূর্য্যের গুণ নিশ্চয়ই ইহারা পাইত, কিন্তু শনিগ্রহ ব্যতীত আর কেহ সে গুণ পান নাই। অতএব পাশ্চাত্য মতে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টিতত্ত্বের কোন সার নাই, কিন্তু এক একটী জ্যোতিষ্ক হইতেই যে অন্যান্য অনেক জ্যোতিষ্ক

বিচ্যুত হইয়াছেন, এই মত শাস্ত্রের অনুকূল হওয়াতে শাস্ত্রোক্তিরই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। অতএব শাস্ত্রে যে জ্যোতিষ্কের যে প্রকারে সৃষ্টি ও যে প্রকার স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে;

সৃষ্টি-রহস্য। (৫)

যে ঘূর্ণ্যমান সূর্য্যের স্খলিত বীর্য্যরূপ অংশ বিশেষ হইতে শনিগ্রহের উৎপত্তি; সেই সূর্য্যের অংশ বিশেষই বৈবস্বত মনু অথবা শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য এই মনুর বংশে উৎপন্ন, এই হেতুই মনুজ, মানব, মনুষ্য, ম্যান, মন্দে প্রভৃতি শব্দে পরিচিত হওয়াকে পৃথিবীর অধিকাংশ নরগণ গৌরবার্হ মনে করিয়া আসিতেছেন। সমস্ত মানবের পূর্ব্বপুরুষ সেই মনু এখন কোথায় আছেন; আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক মধ্যে অথবা অন্য কোথাও বিরাজ করিতেছেন, জানিনা বটে, কিন্তু তাঁহার আয়ুষ্কাল প্রায় সূর্য্যের সমান; আকৃতি ঠিক সূর্য্যের মত না হউক, তাঁহার অনেক সৌসাদৃশ্য মনুতে বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ এই মনুই পাশ্চাত্য ধর্ম্মগ্রন্থে "নু" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রাণিবংশ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব মন্বন্তরের প্রাণিসমূহ বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখিয়া ভগবানের আদেশ ক্রমে ইনিই পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় প্রাণীর বংশরক্ষার উপযোগী বীজ সকল লইয়া পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধ আকাশে যথায় সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিত, তথায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

এদিকে পৃথিবী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ সম্ভবতঃ সূর্য্যের আকর্ষণে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় প্রবল তাপে দগ্ধীকৃত ও দ্রবীভূত হইয়া যায়; সেই দ্রবীভূত পদার্থ-সমস্ত জলরূপে প্রতীয়মান হইয়া, আকাশ মণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। অতঃপর বহুকালে ব্রহ্মাদি অতি দূরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তনা দ্বারা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় পুনরায় পৃথিবী ও গ্রহ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়; ক্রমে জল শুষ্ক হয়, ও মনুষ্যাদি প্রাণীর বাসোপযুক্ত হইলে ভগবান মনু পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ সেই সকল প্রাণীর বীজ হইতে তাহাদের নিজ নিজ বংশ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার নিজের দশটি পুত্র হয়। সেই পুত্রগণ ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত; দিষ্ট, নাভাগারিষ্ট, করূষ পৃষধ্র এবং কবি নামে খ্যাত। তদ্ভিন্ন তাঁহার ইলা অথবা সুদ্যুম্ন নামক যে কন্যা অথবা পুত্র হয়, তাহা কতক কাল স্ত্রীরূপে ও কতক কাল পুরুষরূপে প্রকাশ পাইতেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এখন স্ত্রী পুরুষে যেমন গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে সেরূপ ছিল না। এখনও খুব শিশুকালে যেমন বালক বালিকা শুধু আকৃতি দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না; এবং শুক্রকীটে যেমন স্ত্রী পুরুষের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না; তৎকালে স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করা তদপেক্ষাও কঠিন ছিল। তৎকালে কেবল পুং প্রকৃতি অথবা স্ত্রী প্রকৃতির প্রাধান্য দেখিয়াই পুরুষ অথবা স্ত্রী নির্দ্দেশ করা হইত। দৈব শক্তির মহিমায় স্ত্রী ইলাই এক বৎসর অন্তর পুরুষরূপে পরিণত হইতেন। তিনি স্ত্রীরূপে থাকিবার কালে তাঁহাতে

চন্দ্রাত্মজ বুধের বীর্য্য সংক্রামিত হওয়ায় পুরুরবা নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। ঐ ইলার সুদ্যুম্ন নামক পুরুষরূপ হইতে উৎকল, গয় ও বিমল নামক তিন পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে উৎকল হইতে তাঁহার নামানুসারে উৎকল বা উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকৃত হয়। তাঁহার স্ত্রীরূপে প্রসূত পুত্র পুরুরবা প্রয়াগ তীর্থের নিকটবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান নামক স্থান অধিকার করেন। ইহা হইতেই চন্দ্রবংশীয় সমস্ত-গৌরবান্বিত রাজকুল প্রবর্ত্তিত হয়।

মনুর, জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোদ্ধা দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কুক্ষি পৈতৃক অযোদ্ধা রাজ্যপ্রাপ্ত হন, কনিষ্ঠ নিমির বশিষ্ঠ ঋষির শাপ প্রভাবে মৃত্যু হওয়ায়, মহর্ষিগণ তাঁহার দেহ মন্থন করাতে মিথি নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মথনে উৎপত্তি হওয়াতে তাঁহার নাম মিথি, জন্মদাতার অবর্ত্তমানে জন্ম হওয়াতে তাঁহার নাম জনক, এবং পিতার বিমুক্ত দেহ হইতে উৎপত্তি হওয়ায় তাঁহারই অন্য নাম বৈদেহ। ঋক্‌বেদে ইনি বিদেহ-মাথব নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋক্‌বেদে ঐ বিদেহ-মাথবের একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই নব্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের বাইবেলি সংস্কারানুসারে অনুমান করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ মধ্যএসিয়ার ইরাণ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে, বিদেহ-মাথব মুখে অগ্নি ধারণ করিতেন; পুরোহিত সেই অগ্নি বহিষ্কৃত করিবার জন্য ঘৃত শব্দ উচ্চারণ করাতে তাহা বহিষ্কৃত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হয়;

পুরোহিত ও বিদেহ-মাথব অগ্নির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মিথিলা দেশের পশ্চিমে সদানীরা নদী পর্য্যন্ত আসেন। অগ্নি সদানীরা নদীকে দগ্ধ না করাতে ব্রাহ্মণগণ সে নদী পার হইয়া সদানীরার পূর্ব্বে যাইতেন না। কিন্তু শেষে বিদেহ মাথব মিথিল দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করাতে ব্রাহ্মণগণ তথায় গিয়াছেন।" এই উপাখ্যান হইতেই খৃষ্টানগণ ঠিক করিয়াছেন যে, বিদেহ মাথব প্রমুখ আর্য্যগণ পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্নির উপাসনা রূপ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে যাইয়া যে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছেন, ইহা তাহারই প্রমাণ।" কিন্তু এ অনুমান যে নিতান্ত অযুক্ত তাহা আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। প্রয়োজন বোধ করিলে বারান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। তবে পাঠক এখানেই বিবেচনা করিতে পারেন, "অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বদিকে আসা হইলেও ঐ কথা দ্বারা অযোধ্যার পশ্চিম এবং ইরাণাদি দেশ হইতে আসা বুঝায় না।

সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি বংশীয় মনুষ্যগণের উৎপত্তি যে ঐ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অথবা ঐ সুধাংশুমালী চন্দ্র হইতেই হইয়াছে, তাহা স্থির নিশ্চয়রূপে বুঝিবার অনেকগুলি কারণ আছে। ডারুইনের ক্রমোন্নতিবাদের উপরে বিজ্ঞান বুদ্ধি স্থাপন করিয়া যাঁহারা জলের শম্বুকাদি হইতে মনুষ্যোৎপত্তির অনুমান মান্য করিতে পারেন, তাঁহারা সেই বিজ্ঞান বুদ্ধিকে ক্রমাবনতির দিকে প্রবাহিত করিয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে বর্ত্তমান মানবোৎপত্তি স্বীকার করিলে যে, যুক্তি ও প্রমাণের অধিকতর সাহায্য পাইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। ভূস্তরে

সুবৃহৎ সরীসৃপের পরে ক্ষুদ্র পশুর কঙ্কাল অথবা বুদ্ধিমান মনুষ্য কঙ্কালের পরে বিড়ালের কঙ্কাল দেখিয়াও ক্রমোন্নতি বাদের প্রমাণ হয় না; বানরের সঙ্গে মনুষ্যের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যে, বানর মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ, এরূপ অনুমানও ভ্রান্ত। ইউরোপীয়গণ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া যখন ইজিপ্সিয়ান বা আফ্রিকান আমেরিকান বা উত্তর এসিয়ান প্রভৃতি জাতি অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় উপনীত হয় নাই, বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে, তখন ক্রমোন্নতির মূল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে? পক্ষান্তরে ক্রমাবনতির প্রমাণ—আকাশের সূর্য্যাদি দেবতা হইতে উৎপন্ন বর্ত্তমান ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মনুষ্যাদি। এই উৎপত্তির প্রমাণ সুধু আমাদের শাস্ত্র সমূহে নহে—সর্ব্বদেশীয় কিম্বদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিলক্ষিত হয়।

সেই বহুসাগর ব্যবহিত সুদূর আমেরিকার পেরু দেশীয় রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় রামের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন; রামসীতোয়া নামক পর্ব্বের অনুষ্ঠান করেন। চীন দেশীয় রাজগণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, "ফো" অর্থাৎ বুধগ্রহ একদা কোন রমণীতে উপগত হওয়ায় "য়ু" নামক এক মহাপুরুষ জন্মলাভ করেন, তিনিই চীনরাজের আদিপুরুষ। শাস্ত্রমতে বুধের পুত্র পুরূরবা, তৎপুত্র আয়ু, কিন্তু এখানে আ উপসর্গ বর্জ্জিত য়ু কে বুধের পুত্র বলায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হইতেছে; অবশ্য, ইতিহাস লিখিয়া না রাখার ত্রুটিতেও অনৈক্য হইতে পারে; কিন্তু চীনদের মতেও যে বুধ গ্রহ হইতে তত্রত্য রাজবংশের

উৎপত্তি, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। জাপানের প্রবাদে দেবাসুরের যুদ্ধ আছে, সমুদ্র মন্থন আছে; তত্রত্য রাজা স্বর্গের দেবতা মিকাডো ও তৎপুত্র জিমন্তেমু হইতে তত্রত্য রাজবংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দিয়োদরা প্রণীত তাতার জাতির ইতিহাসে লিখিত আছে যে, পৃথিবী-সঞ্জাতা অর্দ্ধ সর্পরূপিনী এক রমণীতে জুপিটর (বৃহস্পতি গ্রহ) উপগত হওয়াতে শীথেশ নামক একটি পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতেই নাগ বংশ নামক তাতার জাতির উৎপত্তি। এদেশে নাগবংশ নামে প্রথিত রাজারা ঐ নাগবংশ বলিয়াই বোধ হয়। ইয়ুরোপের মূল জাতি জর্ম্মনের পূর্ব্বপুরুষেরা যে "আর্থা" নামে পৃথিবীর পূজা করিতেন, মনুষের সহযোগে সেই আর্থার গর্ভে টুইষ্ট অথবা মঙ্গল গ্রহের উৎপত্তি হওয়া তাহারা বিশ্বাস করিতেন।

বিদ্বান্ লোকেরা অনেক অস্বাভাবিক বিষয়কে স্বাভাবিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন; কিন্ত মুর্খদিগের কখনও তাহাতে প্রবৃত্তি বা সাহস হয় না। সূর্য্য চন্দ্রাদি হইতে মনুষ্য জন্মের অনুমান যেরূপ অলৌকিক অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর সমস্ত দেশে অবৈজ্ঞানিক প্রাচীনেরা বিশ্বাস করে কেন? যে বিষয়ে কল্পনার গতিরোধ হয় তাহাতে বিশ্বাস—শুধু বিশ্বাস কেন, একাগ্রচিত্তে আস্থাবান হওয়া, আপনাপন পূর্ব্ব পুরুষর—যাহাতে সহসাই লোকের অবিশ্বাস জন্মে এমন ব্যক্তিতে মিছামিছি আরোপ করা কখনও কি সম্ভবপর? আমার পিতামহ আকাশের চাঁদ—একথা বলিলে লোকে কি আমাকে পাগল বলিবে না? কিন্তু যদি মনুষ্যগণ সত্য সত্যই চন্দ্র সূর্য্যাদির বংশধর না হইত; তবে কোন্ সাহসে পৃথিবী-

শুদ্ধ সকলেই চন্দ্র সূর্য্যাদিকে মানুষের আদিপুরুষ বলিয়া ঠিক করিল? নেহাত অবিশ্বাস্য কথাওকি সকল লোকে স্বীকার করিতে পারে, এবং সেই কথায় স্থায়ীভাবে লোকের বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে? হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আপনাদিগকে যেমন সূর্য্য পুত্র মনুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, অসভ্য অথবা ম্লেচ্ছাদি জাতিকেও তদ্রূপ মানব বলিয়াই স্বীকার করেন; অতএব তাঁহারা অন্যের উপরে বংশ মর্য্যাদা স্থাপন জন্য এ অস্বাভাবিক কল্পনা করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের প্রকাশিত শাস্ত্রে যে চন্দ্র, সূর্য্য, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দীর্ঘতমা প্রভৃতিকে মানব বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে অবিশ্বাস করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য।

যখন বিজ্ঞান দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে এমন কোন কাল ছিল যখন মনুষ্য জাতি ছিল না, পরে মনুষ্য হইয়াছে; তখন মনুষ্যের আদি পুরুষকে কোনরূপ অমানুষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যে আস্ত আস্ত অসভ্য অশিক্ষিত নর নারীকে সৃষ্টি করিয়া স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করেন নাই—ইহা বিজ্ঞানের কথা। মনুষ্য শিশুকে প্রতিপালন করিতে হইলে ঈশ্বরকেও মনুষ্যবৎ সাজিতে হইত; তাহাকে শীত, বাত, উত্তাপ, অতিবৃষ্টি ও হিংস্র জন্তুগণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং তরল ও লঘুপাক আহার্য্য মুখে ঢালিয়া দিয়া বাঁচাইবার জন্য অস্বাভাবিক উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইত; কিন্তু তিনি যে এরূপ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবে না। ডারুইনের সৃষ্টিতত্ত্বে যখন বহু গোলযোগ তখন তাহা বহু

প্রমাণিত শাস্ত্রীয় সৃষ্টি তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্বীকার করা কখনও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব শাস্ত্রানুসারে চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতেই মানব বংশ প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সৃষ্টি-রহস্য। (৬)

চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি হইতেই যে পার্থিব মানবাদি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আধুনিক লোকের বুঝিতে যত অসম্ভব বোধ হয়, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না; সেরূপ হইলে পৃথিবী শুদ্ধ প্রাচীন জাতিরা কখনও তাহা বিশ্বাস করিতেন না। চন্দ্র সূর্য্যাদির মত দীর্ঘজীবিতা চন্দ্র সূর্য্যাদির মত আকাশ মার্গে গতিবিধি পূর্ব্বতন লোকদিগের প্রতি এরূপ বর্ণনা, সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস অথবা কিম্বদন্তীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার ঐ সমস্ত গুণগুলি এমন ধারাবাহিক রূপে কমিয়া কমিয়া বর্ত্তমান মানবের সাদৃশ্যে আইসার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা বিবেচনা করিতে গেলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, চন্দ্র সূর্য্যাদির সেই সকল গুণ হইতে বিচ্যুত হইয়া হইয়াই বর্ত্তমান মানব এই দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অভিনব খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বাইবেলে যদিও চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে মনুষ্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ নাই, বরং গ্রহ নক্ষত্রাদি পূজার্চ্চার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অতি যত্নে তাহা গোপন করা হইয়াছে; কেবল মানবত্ব রক্ষার অনুরোধে আদি মনুকে 'আদম' নামে ও বৈবস্বত মনুকে 'নূ' নামে

স্মরণ করা হইয়াছে; জুপিটর, টুইষ্ট প্রভৃতির পূজক মণ্ডলীকে বহুযত্নে নিগৃহীত করা হইয়াছে; তথাপি সেই বাইবেলেও দেখিবেন; মুর বয়স হইয়াছিল, সহস্র বৎসর, তাঁহার পুত্রের বয়স নয় শত বৎসর, নাতির বয়স ৮ শত বৎসর—এইরূপে ক্রমান্বয়ে কমিয়া কমিয়া বাইবেল লিখিবার সময়ে মানবের বয়স ২। ৩ শত বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখনকার লোকের ঐরূপ বয়স প্রত্যক্ষ ঘটনা অথবা বিশ্বাস যোগ্য প্রামাণ্য বিষয় না হইলে মিছামিছি অস্বাভাবিক কল্পনা করিয়া উদ্দিষ্ট নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মতের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করা হইত না। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের বয়স যে ঐরূপ অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহা নব্যমতের উপাদান বাইবেল দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদের অসংখ্য শাস্ত্রসমূহের পরস্পরে অন্যান্য বিষয়ে যদিও বহু বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি এবিষয়ে সকলেই একমত। সকল শাস্ত্রেই দেখিবেন, সূর্য্যপুত্র মনু বর্ত্তমান মানব বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার পুত্রগণ এই ভারতবর্ষেই অযোধ্যা প্রভৃতি নানাদেশে বাস করিতেছিলেন; তাঁহাদের কোন কোন পুত্র ভারতবর্ষে স্থান না পাইয়া অন্যান্য দেশে গিয়াছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী সেই মানবগণ কখনও কখনও নভোমণ্ডলেও বিচরণ করিতেন; তাঁহারা স্বীয় তেজে কখন কখন স্বর্গের দেবতাদিগকেও অতিক্রম করিতেন; তাঁহাদের বয়স চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় লক্ষ লক্ষ সহস্র সহস্র বৎসর ছিল, ইত্যাদি।” ঐ সকল ক্ষমতা যে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; বিবিধ শাস্ত্র হইতে আমরা সে

প্রমাণও বহুপ্রাপ্ত হইয়াছি। শাস্ত্রসমূহে দেখিবেন; সূর্য্য বংশে মান্ধাতা পর্য্যন্ত ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই আপন বলে আকাশে বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কাহারও যে ঐ ক্ষমতা ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বরং ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দেওয়ার জন্য বিশ্বামিত্রের বহু তপস্যা ব্যয় করিতে হইয়াছিল; ত্রিশঙ্কু কেবল বিশ্বামিত্রের অসাধারণ অনুগ্রহে দক্ষিণ আকাশে (নিম্নদিকে মস্তক ও উর্দ্ধে পদ বিশিষ্ট একটি জ্যোতিষ্ক রূপে) স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রও বহু দান যজ্ঞ তপস্যাদির বলে স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন; ইহার পরে আর কেহই আপন বলে আকাশে যাইতে পারেন নাই। ইহার পরে সগর, রঘু, দশরথ প্রভৃতি অতীব প্রবল প্রতাপ বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহারা নিজবলে আকাশে যাইতে পারেন নাই, তবে দেবতাদিগের প্রয়োজন মতে কাহাকে কাহাকে দেবযানে করিয়া আকাশে নেওয়া হইয়াছে মাত্র। আকাশে গমনের কথা যদি কবিকল্পনা হইত, তবে মান্ধাতা প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিকতর রূপে বর্ণিত সগর, রঘু, দশরথ প্রভৃতিকে স্বীয়বলে আকাশে বিচরণ করাইয়া কবি পরিতৃপ্ত হইতেন। কিন্তু যাহাকে যে গুণ দিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাকে সে গুণ দিতে পারেন না, বলিয়াই সগর প্রভৃতির সে ক্ষমতা উল্লেখ হয় নাই; এবং বিশ্বাস যোগ্য সত্য ঘটনা বলিয়াই মান্ধাতা প্রভৃতির পক্ষে সে ক্ষমতা উল্লেখ করিতে ইতিহাস লেখকের কোন সঙ্কোচ জন্মে নাই।

চন্দ্রবংশে নহুষ স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন,

এবং তিনি আপন বলে সপ্তর্ষি মণ্ডলেরও ঊর্দ্ধে আকাশে বিচরণ করিতেন ; মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই তিনি সর্পাকারে পরিণত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন। নহুষের পুত্র যযাতি শুক্রগ্রহের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং আকাশে বিচরণ করিতেন। তাঁহার গ্রহের ন্যায় তেজ ও ক্ষমতাদি দেখিয়াই শুক্রনন্দিনী তৎপ্রতি আশক্তা হইয়াছিলেন। যযাতির পরে আর কাহারও সম্বন্ধে স্বীয়বলে আকাশে পর্য্যটন প্রসঙ্গ আমরা শাস্ত্রে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু দুষ্মন্তের সময়ে যে নিশ্চয়ই লোকের ঐ ক্ষমতা রহিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন ; "তুমি আমার মহিমা জাননা ; তুমি ভূমিতে বাস কর, আমি স্বর্গ ও ভুবলোকে পর্য্যটন করিতে পারি ইত্যাদি"। চন্দ্র হইতে যযাতি পঞ্চম পুরুষ অধস্তন, সুতরাং যযাতিতে চন্দ্রের ক্ষমতা কতকটা ছিল, কিন্তু একবিংশতি পুরুষ অধস্তন দুষ্মন্তের চন্দ্রোচিত ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে অবলার নিকটেও তিরস্কার শুনিয়া সহ্য করিতে হইল। তিরস্কারকারিণী শকুন্তলা যে বিশ্বামিত্রের কন্যা, তিনি চন্দ্রের পঞ্চদশ পুরুষ অধস্তন, অথচ অসাধারণ যোগবলে বলীয়ান্, সুতরাং তাঁহার আকাশাদি সর্ব্বত্র বিচরণ ক্ষমতা ছিল ; তাঁহার ঔরষে ও স্বর্লোকাদি সর্ব্বত্রচারিণী মেনকা অপ্সরার গর্ব্ভে উৎপত্তি হেতু শকুন্তলারও সে ক্ষমতা ছিল; সে জন্যই তিনি স্বামীর প্রতি অমন আস্পর্দ্ধা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন . শকুন্তলা অপেক্ষা সহস্র গুণে মুখরা ও

কাষ্ঠা হইয়াও দেবযানী যযাতিকে অমন কথা বলিতে সাহসী হয়েন নাই যেহেতু যযাতির সে ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। পৌরাণিক ইতিহাস যদি কবিকল্পনা হইত, তবে সাধ্বী সুশীলা শকুন্তলার মুখে ওরূপ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ না পাইয়া পৌরাণিক স্ত্রীগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়া দেবযানীর মুখে ঐ আস্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইত।

যে বিষ্ণু পারিষদ জয়-বিজয় অভিশপ্ত হইয়া হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ও রাবণ কুম্ভকর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই জন্মান্তরে শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু সূর্য্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, রাবণ কুম্ভকর্ণ সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ; ইহারা অনায়াসে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল অর্থাৎ আকাশের জ্যোতির্ম্ময় বহু ক্ষমতাপন্ন গ্রহ-জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি, পৃথিবীবাসী সমস্ত প্রাণী ও ভূগর্ভস্থ লোক সমূহকে পরাজয় করিয়া ফিরিতেন; কিন্তু শিশুপাল দন্তবক্র রূপে তাঁহাদের আকাশে পাতালে যাওয়ার ক্ষমতাও হয় নাই সেই সকল লোকবাসীদিগকে পরাজয়ের প্রশ্নও হয় নাই। শিশুপাল দন্তবক্র দুষ্মন্তাদি অপেক্ষাও বহুপুরুষ পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের রাবণ কুম্ভকর্ণের আত্মাই সময়োচিত ও বংশোচিত স্বভাবানুসারে প্রায় আধুনিক মানবরূপে পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপরে আধিপত্য চালাইয়াছিলেন। ইহাঁদের ইতিহাস কবিকল্পিত হইলে কবি রাবণ কুম্ভকর্ণাদির ন্যায় শিশুপাল দন্তবক্রাদিকেও স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল বিজয়ী অতি বড় দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলিতেন। পুরাণ সমূহে সমধিক বিস্তৃত রূপে দ্বাপরের শেষাংশের অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কালের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে জরাসন্ধ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন অনেকের অনেক গুণ উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু যদি প্রাচীন ইতিহাস কবিকল্পিত হইত, তবে ইহারা নভোমণ্ডল পর্য্যটনক্ষমরূপে কল্পিত না হইয়া সেই যযাতির সমকালীন লোকদিগকে ঐ ক্ষমতায় কল্পনা করা হইবে কেন? এদিকে কেবল অর্জ্জুন দেব-প্রদত্ত রথের সাহায্যে আকাশ মণ্ডলে গমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে ক্ষমতা দেবতাদিগের আয়ত্ত ছিল; তিনি নিজ উপকারের জন্য সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। জরাসন্ধের পিতামহ উপরিচর রাজাও তদ্রূপ দেবরথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু উপরিচর রাজাকে মিছামিছি ঐ রথে চড়ানে যে কবির কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, পৌরাণিক কথা কল্পিত নহে; সত্য সত্যই অতি পূর্ব্বকালের লোকেরা চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় আপন বলে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিতেন।

চন্দ্র সূর্য্যাদি যেমন বহু লক্ষ লক্ষ বর্ষ যাবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহাদের বংশধরগণও যে বহুকাল জীবিত থাকিতেন, তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান, জাম্বুবান অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে বর প্রভাবে চিরজীবী করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক মহাপুরুষকে যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। যাঁহারা এক ব্যক্তির জীবনে ৫০। ৬০ পুরুষের অস্তিত্ব দেখিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণে হতভম্ব হন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে,

যেমন এক সূর্য্যের জীবনকালে লক্ষ লক্ষ পুরুষ পরম্পরার আবির্ভাবে কোন সন্দেহ হয় না, তদ্রূপ সূর্য্যের অধস্তন একটি পুরুষের জীবনে ৫০। ৬০ বা শত সহস্র পুরুষ ক্রমান্বয়ে জন্ম-গ্রহণ করিলেও কোন সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। যে বশিষ্ঠ ঋষি এখনও সপ্তর্ষি মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন,—আমরা নিত্য যাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় ৫০। ৬০ পুরুষ-পরম্পরার পৌরোহিত্য করিতে দেখিয়া বিস্ময় জন্মিবে কেন? যে হউক, আমরা এখানে গুটি কত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাচীনদিগের বয়সের প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেব-যানীর সহচারিণী দৈত্যনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনাক্রমে তৎসহ-বাসে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, এই জন্য শুক্রাচার্য্য অভি-শাপ দিলেন যে, "তুমি জরাগ্রস্ত হও।" তখনই যযাতি জরাক্রান্ত হইয়া অনুনয় বিনয় করাতে শুক্র আদেশ করি-লেন, "তুমি এই জরা যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিয়া তাহার যৌবন তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবা। যযাতি তদনুসারে যদু প্রভৃতি পাঁচ পুত্রকে একে একে বলিলেন, "তুমি এক সহস্র বৎসরের জন্য আমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন প্রদান কর, সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় আমি জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে যৌবন প্রদান করিব, এবং আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিব।" যদু প্রভৃতি চারি জনেই পিতার সে কষ্টকর আদেশ রক্ষা না করিয়া অভিশাপ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু তাহা স্বীকার করিয়া এক সহস্র বৎসর জরা ভোগ করতঃ পিতার অনুগ্রহে পুনরায় যৌবন ও রাজ্য

লাভ করিলেন। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, যযাতি পাঁচ পুত্রের পিতা হইয়াও যৌবন দশায় উপনীত কনিষ্ঠ পুত্রকে এক সহস্র বৎসর জরা দিয়া তাহা হইতে পুনরায় জরা গ্রহণ করতঃ আরও দীর্ঘকাল তপস্যাদি করিলেন সুতরাং তাঁহার বয়স সহস্র বৎসরাপেক্ষাও অনেক অধিক বোধ হয় কিনা ? কবি যদি পূর্ব্বে বলিতেন যে, যযাতির অথবা তাঁহার সম-কালিক লোকের বয়স বহু সহস্র বৎসর ;" এবং সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য সহস্র বৎসরীয় জরার উল্লেখ করিতেন, তবে তাঁহার একটা কল্পনার উদ্দেশ্য বুঝা যাইত ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের প্রচারকগণ কেহই ঘুণাক্ষরে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। লোকে যাহা সম্ভব মনে করে না, তাহা তিনি মিছামিছি লিখিবেন কেন ? তিনি ঐ জরার কাল সহস্র বৎসর না বলিয়া পঞ্চাশ বৎসর বলিলেও তাঁহার দীর্ঘ-কাল রূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্য সাধিত হইত। বিশেষতঃ প্রিয় পুত্রকে হাজার বৎসরের কথা বলিয়া সন্ত্রাসিত না করিয়া অতি অল্প কালের কথা বলাই সঙ্গত হইত। এতদ্বারা কি ইহাই বুঝা যায় না যে, তৎকালীন লোকের বয়ঃক্রমে সহস্র বৎসর অতি অল্পকাল ?

মহাভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রচিত। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-বেদ-ব্যাস নামে যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, মহাভারতই তাহার প্রমাণ। তিনি সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। সত্যবতীর তৃতীয় পুত্র পত্নীত্রয় সহ যৌবনের অপব্যবহার করতঃ কতককাল যক্ষ্মারোগে কষ্ট পাইয়া অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ব্যাস মাতার অনুরোধক্রমে বিধবা ভ্রাতৃ-

বধূতে উপগত হইয়া ক্রমান্বয়ে তিন পুত্রের জন্ম দাতা হন। তাঁহার মধ্যম পুত্র পাণ্ডু অভিশপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি যৌবন গত প্রায় দেখিয়া পত্নীদ্বয়কে দেবতা দ্বারা সন্তানোৎপাদনে নিযুক্ত করেন। তৎকালোৎপন্ন ধনঞ্জয় প্রভৃতি পুত্রগণ যৌবনে উপনীত ও অস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় কৃতী হইয়া দীর্ঘকালের জন্য দেশান্তরিত হন। ইহার পরে ধনঞ্জয়ের অভিমন্যুনামে পুত্র হয়। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ; পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়। জন্মেজয়ের পুত্র শতানীক এবং অশ্বমেধ দত্ত নামে পৌত্র হইবার পরে জন্মেজয় মহাভারত শ্রবণ করেন। সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ যখন উৎপন্ন হইয়াছে, তখনও তিনি জীবিত ও চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। অষ্টম পুরুষ জন্মিবার সময়ে ব্যাসদেবের অন্যূন ২ শত বৎসর বয়স নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ইহারও বহু শত বর্ষ পরে শঙ্করাচার্য্যের সমকালে ব্যাস মুনিকে বিশিষ্ট লোকেরা যে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ব্যাস ঋষি এখন আছেন কিনা, না জানিলেও তিনি ১৭। ১৮ শত বৎসর যে জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্যাস ঋষিকে আমরা দ্বাপরের শেষাংশ হইতে দেখিতেছি বলিয়া যে তিনি দ্বাপর যুগের নির্দ্দিষ্ট আয়ু প্রাপ্ত হন নাই, তাহার কারণ এই যে তিনি দ্বাপরের শেষাংশে যে পরাশর ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পরাশর ঋষি আকাশস্থ সপ্তর্ষির অন্যতম বশিষ্ট ঋষির পৌত্র। এ মন্বন্তরে ঐ বশিষ্ট ঋষি সূর্য্য সহোদর

মিত্রাবরুণের পুত্র; অতএব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্য্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষস্থানীয়, এতদ্ভিন্ন তাঁহার যোগবলও দীর্ঘায়ুর অন্যতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু আভিজাত্য বলই যে মুখ্য কারণ এবং তাহা যোগবলেরও সহায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সৃষ্টি-রহস্য। (৭)

যাঁহারা এতকাল চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিকুলের সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, আপনাদিগকে সূর্য্যপুত্র মনুর সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া আসিয়াছেন, আপনাদের গোত্র-প্রবরে অঙ্গিরা, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিষ্কের নাম প্রয়োগ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই প্রাচীন হিন্দু সন্তানের নিকটে গ্রহ জ্যোতিষ্ক হইতে মানবোৎপত্তি ব্যাখ্যা করা নিতান্ত অনাবশ্যক; কিন্তু যে সকল অর্ব্বাচীন জাতি পূর্ব্ব-পুরুষদিগের গৌরব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগকে এবং তাহাদের শিক্ষালাভে দিশাহারা কোন কোন হিন্দু বংশধরকেও বুঝান আবশ্যক হইয়াছে যে, মনুষ্য জাতির উৎপত্তি বানর হইতে হয় নাই,—মনুষ্য জাতিকে ঈশ্বর-কুম্ভকার মাটি ছেনিয়াও গঠন করেন নাই,—মনুষ্যজাতি ঐ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া অল্পে অল্পে বর্ত্তমান আকার প্রকারে উপনীত হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ বাহ্যাংশে মানবদেহের ন্যায় জড় হইলেও প্রকৃতপক্ষে জড় নহে; মানবদেহে যেমন সর্ব্বপ্রকারে জড়ের

লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইচ্ছাহইতেই ইচ্ছাশক্তি কার্য্যক্ষম হয়, তদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্যাদির বাহ্য অবয়ব জড় হইলেও তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা যথেষ্ট আছে। হিন্দুর জীবন সম্বল ধর্ম্মকর্ম্মের পরম সহায় সমুদয় শাস্ত্র ঐ সকল জ্যোতিষ্কগণের ইচ্ছাশক্তি বা কার্য্যক্ষমতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কোটি কোটি বর্ষ হইতে কোটি কোটি সুধীবর্গ যে সমস্ত শাস্ত্র পরম শ্রদ্ধাসহকারে মানিয়া আসিয়াছেন; তাহার অধিকাংশই ঐ জ্যোতিষ্কগণের উপদিষ্ট।

ঐ সূর্য্যদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অঙ্গিরা ঋষির উপদেশ অবলম্বন করিয়া অঙ্গিরা সংহিতা; ঐ অত্রিঋষি হইতে অত্রি সংহিতা; ঐ বশিষ্টঋষি হইতে বশিষ্ট সংহিতা; ঐ শুক্রগ্রহ হইতে শুক্রনীতি ও উশনা সংহিতা; ঐ বৃহস্পতিগ্রহ হইতে বৃহস্পতি সংহিতা,—এইরূপ আমাদের সুপরিচিত জ্যোতিষ্কগণই অনেক শাস্ত্রের উপদেষ্টা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও যে অনেকে এখন জ্যোতিষ্ক-রূপে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারও প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে দেখিবেন; ভারতীয় রাজকুলাগ্রগণ্য উদয়পুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাও যে মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া তেমন ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহর্ষি হারীত তাঁহারই সমক্ষে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ আকাশে উত্থিত হইয়া দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। মহর্ষি হারীত, হারীত সংহিতার উপদেষ্টা। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বাপ্পারাওর অসাধারণ ক্ষমতার

সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত, যাহা অবিশ্বাস করিলে গুরুতর ভ্রম করা হয়। মহর্ষি হারীত পৃথিবীবাসী হইয়াও যেরূপে অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অতি পূর্ব্বকালীন আরও বহু যোগীপুরুষ যে অন্তরীক্ষে ঐ দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনু প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষদিগের নামে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ পরিচিত হইতেছে, তৎসমুদায় তাঁহাদের শাস্ত্রকর্তৃত্বের যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাহা কোন বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না। যে মনুসংহিতার উপদেষ্টা মনু, ব্রহ্মার অবয়ব অন্তর্বর্ত্তী থাকিবার কালে ভৃগু মরীচি প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়াতে আপনাকে উহাঁদিগের উৎপাদক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সূর্য্য-পিতামহ-মরীচির জনক মনুকে প্রাচীন-গণ কখনও ক্ষুদ্র মনুষ্য স্বরূপ মনে করেন নাই। মনুসংহিতা যেমন সমস্ত আর্য্যজাতির শিরোধার্য্য, তদ্রূপ মহাত্মা মনুও অতীব মান্য। সূর্য্যের প্রপিতামহ এই মনুকে সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট অন্তরীক্ষবাসী মনে করায়, বোধ হয়, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রও যে সেই অন্তরীক্ষবাসী মহাসত্ত্ব মহর্ষিগণের উপদেশ অবলম্বনে প্রণীত, তাহার সবিশেষ প্রমাণ শাস্ত্র সমূহেই বর্ত্তমান। বস্তুতঃ কলিকাল-প্রভাবে সেই স্বর্গীয় মহিমা বিচ্যুত আধুনিক মানব, অন্তরীক্ষবাসীদিগের সঙ্গে আপনাদের যতদূর অসাদৃশ্য ও অসম্বন্ধভাব মনে করে, পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা তাহা কখনও করিতেন না। কলি প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অন্তরীক্ষবাসীদের

সঙ্গে পৃথিবীবাসীদিগের বহুরূপে সম্পর্ক ছিল বলিয়াই তখন অন্তরীক্ষবাসীদিগের শাস্ত্র কর্ত্তৃত্বে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। সেরূপে সম্ভাবিত সম্পর্ক না থাকিলে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণও গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের নামে আপনাপন বহুপ্রয়াস সম্পন্ন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে অভিহিত করিয়া আপনাদের কৃতিত্ব বিলোপ করিতেন না, ও অস্বাভাবিক বর্ণনা হেতু লোকের অবিশ্বাস জন্মাইতে সাহসী হইতেন না; এবং সাধারণ জনগণও তেমন অবিশ্বাস্য বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে তেমন মান্য করিয়া আসিতেন না। যে দেশবাসী তর্ক শাস্ত্রের বিচারে পৃথিবীতে অতুলনীয়, সমস্ত দর্শন শাস্ত্র যাঁহাদের সম্পত্তি, সেই ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তৃগণ নিকটে সেই অন্তরীক্ষবাসীদিগের গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব অসম্ভাবিত ও অবিশ্বাস্য হইলে কি কখনও তাহা তিষ্টিতে পারিত? বলা বাহুল্য যে ঐ সকল দর্শন শাস্ত্রের সূত্রকার কপিল গৌতম প্রভৃতি মহাপুরুষগণও ঐ অন্তরীক্ষবাসীদিগের সহিত বিশেষ সম্পর্কিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যে চার্ব্বাক দর্শন, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের বিরোধী, কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যে চার্ব্বাকদর্শনের বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না; সেই চার্ব্বাকদর্শনে ঐ অন্তরীক্ষবাসী বৃহস্পতিগ্রহ উপদেষ্টারূপে পরিচিত হইয়াছেন। এমন গুরুতর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কি অন্তরীক্ষবাসীদিগের শাস্ত্রকর্ত্তৃত্বে অবিশ্বাস করা উচিত?

যাঁহাদের উপদেশ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছে, বর্ত্তমান মানবের সঙ্গে তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতির বহু বৈসাদৃশ্য হইলেও তাঁহাদের হইতে বর্ত্তমান মানব বংশ প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথায় অবিশ্বাস হইতে পারে না। ঐ

অন্তরীক্ষবাসীদিগকে জড় ভাবিয়া তাঁহাদের শক্তি কর্ত্তৃত্বাদি অবিশ্বাস করায় যে কেবল অহম্মুখতা প্রকাশ পায়, তাহা বিবেচক ব্যক্তিকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যখন ব্রহ্মই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার পদার্থরূপে পরিচিত হইতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকল পদার্থেই থাকা স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ যখন নব্যবিজ্ঞানের স্বীকৃত উপাদান গুলিদ্বারা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, গাছ, পাথর প্রভৃতি জগতের সমস্ত পদার্থই গঠিত হইয়াছে বলা হয়, তখন সেই সকল পদার্থ মানবরূপে পরিণত হইয়া ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারে, অথচ গ্রহ জ্যোতিকরূপে পরিণত হইয়া সেই ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারে না; ইহা বলা অযুক্ত। আপনাকে বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা লোকের একটা প্রকৃতিসিদ্ধ মহাভ্রম। যদিও মনুষ্যের সঙ্গে নিত্য বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হইতেছে, পরীক্ষায় অনেক সময়ে আপনাকে হার মানিতে হইতেছে, তথাপি কেহ আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্বীকার করে না। যাহার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নাই, সেই নির্ব্বোধ বলিয়া গণ্য হয়। পিপীলিকা, মশক, ছারপোকা প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীর কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধি মনুষ্যবুদ্ধির অনেক অতিরিক্ত পরীক্ষিত হইলেও মনুষ্য তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করে না। আর ঐ চন্দ্র সূর্য্যাদি—যাঁহারা আমাদের বহুদূরে অবস্থিত; যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার কোন পরিচয় আমাদের পাওয়া অসম্ভব, তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ জড় পদার্থ বলিয়া ভাবা মানবের স্বাভাবিক ধৃষ্টতা হইতে পারে কিন্তু চিন্তাশীলতা ও যুক্তি

প্রমাণের কথা নহে। মনুষ্য যে উপাদানে গঠিত হইয়া বুদ্ধিমত্তাদি পাইতে পারে, সেই উপাদান গুলিকেই বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই উপাদান বিশিষ্ট অন্যান্য অবয়বের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যক্ষমতা প্রভৃতিতে অবিশ্বাস করা কি নির্বুদ্ধিতা নহে? এইরূপ নির্বুদ্ধিতা অবলম্বন করিয়া অন্তরীক্ষবাসী গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের শাস্ত্র কর্ত্তৃত্ব ও মানবের পূর্ব্বপুরুষত্ব অস্বীকার করা কি উচিত?

সৃষ্টি-রহস্য। (৮)

যে কলি প্রভাবে লোক সমূহকে বিকৃতবুদ্ধি হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; লোকসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইবে; সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করিবে; ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিবে; ইত্যাদি বিষয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ যে কলির ধর্ম্ম বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেই কলি সমুপস্থিত হইয়াছে; নতুবা আমাদের সর্ব্বশাস্ত্র সমাদৃত সৃষ্টি রহস্য বুঝাইবার জন্য অধিক কথা বলিতে হইবে কেন? ব্রহ্মাণ্ডের আদি সৃষ্ট গ্রহ জ্যোতিষ্ক প্রভৃতিকে যে পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বহু ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতা বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে উল্লেখ করিতেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ উহাঁদিগকে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিবে কেন? চন্দ্র সূর্য্যের বংশধরগণ আজ শাখামৃগকে পিতামহ বলিবার জন্য লালায়িত কেন? প্রত্যেক বিষয়ে যে পূর্ব্ব পুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাদিগকে অসভ্য কৃষক,

ধূর্ত্ত, প্রতারক, প্রভৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইবে কেন ? শাস্ত্রে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের যে সকল নিদর্শন রহিয়াছে ; যদি ধীর ভাবে তৎপ্রতি বিবেকবুদ্ধি পরিচালন করা যায়, তবে কি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অমানুষ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বর্গীয় দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয় না ? কিন্তু সে পূজার পরিবর্ত্তে আজ তাঁহা-দের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কেন ?

সেই শাস্ত্রকর্ত্তাগণ যে ঐ চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক অথবা উহাঁদের অপেক্ষাও উর্দ্ধতন লোকবাসী কোন প্রকার মহা-পুরুষ হইবেন, তাহার প্রমাণ আমরা সমস্ত বিদ্যা হইতে প্রদ-র্শন করিতে পারি ; অদ্য আমরা দেখাইতেছি সংস্কৃতভাষাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই সংস্কৃত ভাষা যদি আধুনিক লোকের ন্যায় মনুষ্য দ্বারা গঠিত হইত, তবে কি কখনও এরূপ সুসম্পন্ন হইতে পারিত ? মনুষ্যের যদি সেই ক্ষমতা থাকে তবে আজ এত সভ্যতার কালে তেমন একটা ভাষা গঠিত হয় না কেন ? মনুষ্য ঠিক যতগুলি স্বর উচ্চারণ করিতে পারে, আধুনিক সভ্যের মস্তক হইতে ঠিক ততগুলি অক্ষর প্রসব হয় না কেন ? এখন পৃথিবীশুদ্ধ মনুষ্য ভাষার আদর্শ লইয়া যে ভাষা গঠিত হইতে পারে না, অতি ক্ষুদ্র আর্য্যাবর্ত্তে বসিয়া তাহা কিরূপে হইল ? "ক" এর পরে "খ" "অ" এর পরে "আ" এরূপ প্রণালী বদ্ধ করিয়া সাজাইতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা কি আধুনিক লোকের আছে ? য র ল ব এক শ্রেণীতে কেন নির্দ্দিষ্ট হইল, কেনইবা সম্পূর্ণ কিম্ভূত "স" এর নিকটে "হ" বর্ণের অবস্থান হইল—এখন কয়টি বৈদেশিক সভ্য তাহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন ?

অক্ষর সৃষ্টি আগে হইয়াছে না ভাষা সৃষ্টি আগে হইয়াছে, কিম্বা বিজ্ঞান সৃষ্টি আগে হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহারই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। ভাষানভিজ্ঞ কোন অসভ্য মনুষ্য দ্বারা কোন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ কোথাও নাই। ইংলণ্ডাদি দেশে এখন ভাষার উন্নতি যথেষ্ট হইয়া থাকিলেও সাধারণ ভাষা সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজগণের অসভ্য সাময়িক পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সর্পাদির ন্যায় গর্ত্তে বাস করিত, তখন তাহাদেরও জীবন যাত্রার উপযুক্ত একটা ভাষা ছিল। তখন সেই ঘোর তর অসভ্যতার কালেও তাহারা ম্যান, মৌথ, নোস, আই, ইয়ার, হ্যাণ্ড, নেভেল প্রভৃতি এমন সকল শব্দ রক্ষা করিয়া ছিল, যদ্দ্বারা তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় আর্য্যদিগের সম্পর্ক থাকা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তাহাদের ঐ ভাষা যে তাহাদের অসভ্য সময়ের গঠিত নহে, তাহা অনায়াসেই স্বীকৃত হইবে। ইহার পরে তাহারা রোমাণ-গুরুকুলের বেত্রাঘাতের সঙ্গে যে ভাষা ও রীতি নীতি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহাদের বর্ত্তমান ভাষার উন্নতির কারণ। ইংরাজগণ ইদানীং অনেক নূতন পদার্থ ও নূতন কার্য্যের নাম সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও যে ভাষা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল নাম সৃষ্টি করা যায়, সে ভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে নব্যমতে অন্যূন চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস আছে; কিন্তু কোন ইতিহাসেই এমনটি পাওয়া যায় নাই যে, কোন দেশের কোন অসভ্য জাতি পূর্ব্বে কিছুমাত্র কথা বলিতে পারিত না; তাহারা ক্রমে চেষ্টা করিয়া কথার সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবী ভরা অসভ্যজাতি মধ্যে যখন ভাষা সৃষ্টির একটা প্রমাণ

ও হাজার বৎসরের মধ্যে মিলিতেছে না, তখন অসভ্য মানব দ্বারা ভাষা সৃষ্টি হওয়ার অনুমান কি একান্ত অপ্রামাণ্য ও ভ্রান্ত নহে?

মানবদ্বারা ভাষা উৎপন্ন হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বিনষ্ট হওয়ার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মনে করুন, যে ইংরাজের অসভ্যাবস্থ পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য-বংশ-সম্ভূত বলিয়া মীমাংসিত হইতেছে, তাহারও পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য থাকিবার কালে "ত" অক্ষর সম্বলিত শব্দমূলক ভাষা অবশ্য ব্যবহার করিত, কিন্তু ইংলণ্ডে অবস্থান কালে প্রয়োজনাভাব অথচ শিক্ষার অভাবে "ত" বর্ণের ব্যবহার না থাকায় তন্মূলক শব্দ গুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের ও তৎসম্বলিত শব্দের বিলোপ পরিলক্ষিত হয়। এদেশেও ঋ, ৯, য, ব, প্রভৃতি অক্ষরের উচ্চারণ যে পূর্ব্বকার মত নাই, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। অতএব মনুষ্য দ্বারা অক্ষরের সৃষ্টি না হইয়া অক্ষরের বিলয় হওয়াই সুপ্রমাণিত হইতেছে। যে মনুষ্য অক্ষরের স্রষ্টা না হইয়া বরং বিলয়কারী বলিয়া প্রমাণিত, সেই মনুষ্য দ্বারা পূর্ব্বে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অযুক্ত। এ বিষয়ের প্রমাণ আমরা সহজেই করিতে পারিব। যদি কেহ প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ঐ সভ্যতম ইংলণ্ডেই প্রবেশ করুন। তথায় যে নিরক্ষর ব্যক্তি সংস্কৃতাদি কোন ভাষার সঙ্গে "ত" অক্ষরের উচ্চারণ শুনে নাই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনও "ত" অক্ষরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না; এবং "ত" না থাকাতে তাহার ভাষা যে অসম্পন্ন আছে, অথবা অন্য ব্যক্তি

যে "ত" অক্ষর বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতে পারে, তাহা কথনই সে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবে না। ত অক্ষরটিকে সে চিরজীবন চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

অভাব বুঝান সত্বেও যে মনুষ্য চিরজীবনে একটা অক্ষরের আবিষ্কার করিতে না পারে, সেই মনুষ্য—যখন অসভ্যাবস্থায় অভাব বোধ ছিল না; অভাব চিন্তা করিবার সহায় স্বরূপ ভাষা ছিল না; তখন কিরূপে ঊনপঞ্চাশটা অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিল? বলা বাহুল্য,—আগে অক্ষর ফুটিলে তবে শব্দ ফুটিবে, একটা শব্দের সঙ্গে আরও অন্যূন একটা শব্দ হইলে তবে কথা বলা চলিবে; একজনের সৃষ্টি করা একটা নূতন কথা অন্য ব্যক্তি যে তৎক্ষণাৎ শিক্ষা করিতে পারে না, বালক ও বৈদেশিকগণই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; সুতরাং কেহ কোন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিলেও তাহা কাজে লাগে না। বালক যে সকল হিজিবিজি কথা নূতন সৃষ্টি করে, তাহা কি সে নিজেই মনে রাখিয়া থাকে? যখন ভাষা ছিল না, তখনকার প্রাচীনকে এখনকার শিশু অপেক্ষাও মূর্খ বলিতে হইবে; যেহেতু এখনকার শিশুদিগের নিকটে জন্ম জনে নানা কথা বলিতেছে; সে তাহা শিখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট; সুতরাং তাহার মুখে অক্ষর ও শব্দ সহজেই আসিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে কথা শুনে নাই; সে অতি প্রাচীন হইলেও অতি শিশুর ন্যায়, হোঙ্গা হোঙ্গা করিয়া ক্রন্দন করা অথবা জন্মবধিরের ন্যায় "বো" "বো" করা ভিন্ন আর কোন শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে না। বোবার বাক্‌যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও কেবল বধিরতা বশতঃ অন্যের উচ্চারণ শিক্ষা করিতে

না পারিয়া চিরজন্মে নিজে একটা অক্ষরও উচ্চারণ করিতে পারে না।

অন্যের নিকট শিক্ষা না পাইয়া কেবল নিজ মন হইতে কোন অক্ষর প্রসব হইতে পারেনা। অতএব সংস্কৃতের উনপঞ্চাশৎটি অক্ষর কখনও মনুষ্যদ্বারা উদ্ভাবিত হয় নাই। অক্ষর উদ্ভাবিত না হওয়ায় মনুষ্যদ্বারা ভাষাও গঠিত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সংস্কৃত অথবা অতি প্রাচীন কালীয় শব্দ সমূহ মধ্যে এমন গভীর বিজ্ঞানের উপলব্ধি হয় যাহা অসভ্য কেন—অতিবড় পণ্ডিতের পক্ষেও সেই সমস্ত বিজ্ঞানে নির্ভর করিয়া শব্দ সৃষ্টি করা কঠিন। পূর্ব্বে বিজ্ঞান জানিলে তবে তো শব্দ সৃষ্টি করা হইবে? যখন ভাষা হয় নাই তখন বিজ্ঞানইবা কিরূপে হইল? হঠাৎ বরং এক আধটা শব্দ ফুটিতে পারে। মনে করুন, যেন কৃ, ধৃ, ভূ প্রভৃতি গোটাকত ধাতু প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কৃধাতুতে নিষ্পন্ন কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি শতাধিক শব্দ যে নিয়মে গঠিত হইয়াছে, ধৃ-ধাতুতে নিষ্পন্ন ধর্ত্তা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুসংখ্যক শব্দও সেই নিয়মে গঠিত হইয়াছে। যাহারা শব্দ বিজ্ঞান জানে না তাহারা কি এই নিয়ম ঠিক করিয়া শব্দের নুতন সৃষ্টি করিতে পারে? কেহ হয় ত মনে করেন যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা গঠিত হইবার পূর্ব্বে আর একটা ভাষা ছিল, তৎসাহায্যে সংস্কৃতের ভাষা বিজ্ঞান সৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা সংস্কৃতের পূর্ব্বে যে বৈদিক ভাষা প্রাপ্ত হই তাহাতে মাঝে মাঝে অনেক শব্দ পরিলক্ষিত হয়, যাহাতে সংস্কৃতের আধুনিক নিয়ম প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু সেই সকল শব্দও যে নিয়মের একে-

ধারে বাহিরে নহে—অন্যরূপ নিয়ম দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে কতকটা পরিলক্ষিত হয়।

শব্দের মধ্যে সমস্ত বিজ্ঞান নিহিত। যেমন শনৈশ্চর নামটি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ (আড়াই বৎসরে এক একটি রাশিতে) বিচরণ করিতে দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ মাস, ঋতু, তিথি প্রভৃতির নামে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিশেষরূপে প্রকটিত হইতেছে। যে ইংরাজগণ অসভ্য পুরুষানুক্রমে নেভেল Navel শব্দটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সংস্কৃতে তাহা "নাভি"। বন্ধনার্থক "নহ" ধাতু হইতে এই নাভি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে পদার্থের সঙ্গে নানাদিক্ বিস্তীর্ণ পদার্থগণ সম্বদ্ধ, সেই পদার্থকে নাভি বলা হয়। মনুষ্যের নাভির সঙ্গে শাস্ত্র মতে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী বান্ধা রহিয়াছে, এজন্য তাহা নাভি; গাড়ীর চাকার মধ্যস্থ যে কাষ্ঠের সঙ্গে অর সমূহ দ্বারা চাকাটিকে বন্ধন করা হয়, সেই কাষ্ঠের নাম নাভি; আর, যে সূর্য্যের সঙ্গে আকর্ষণ রূপ রজ্জু দ্বারা গ্রহগণ বদ্ধ রহিয়াছে, সেই সূর্য্যের নামও নাভি। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবী ও গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের বন্ধন সম্বন্ধে বহুপ্রমাণ ঋক্ বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহে আছে; যথা :—

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথ্বীং অরংনাৎ
অস্কম্ভনে সবিতা দ্যাং অদৃংহৎ।

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডল ১৪৯ সুক্ত।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, "সবিতা (সূর্য্য) পৃথিবীকে রজ্জুযন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন, ও স্বর্গকে নিরবলম্বনে রাখিয়াছেন।" সূর্য্য কর্ত্তৃক পৃথিবী বন্ধনে যখন কোন স্থূলরজ্জু

কল্পনারও অযোগ্য, তখন ঐ রজ্জু শব্দ আকর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে না। শাস্ত্র সমূহের বহু-স্থানে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে রজ্জু, কেশ, সর্প ও নাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল পদার্থ আকর্ষণ ধর্ম্মী আত্মারই বিভিন্নরূপ বিকাশ মাত্র। শাস্ত্রোক্ত যে সহস্র মস্তক বিশিষ্ট অনন্ত নাগের এক মস্তকের একাংশে এই বিশাল পৃথিবী সর্ষপ বিন্দুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন তাহা অসীমত্ব জ্ঞাপক অনন্ত শব্দে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বত্র-বিস্তৃত আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সূর্য্যাদি দেবতা ও অসুরগণ যে বাসুকী রূপ রজ্জু দ্বারা মন্দর পূর্ব্বত বন্ধন করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার আকর্ষণ। ব্রহ্মার যে কেশগুলি "অহি" হইয়াছিল; এবং "ক" অর্থাৎ মস্তক হইতে উৎপন্ন হওয়া বশতঃ যে সর্প জননী কদ্রু নামে খ্যাত, তাহাও আকর্ষণ। শিবের যে কেশ কলাপ ব্যোম বিস্তীর্ণ হওয়াতে শিবের নাম ব্যোমকেশ, তাহাও আকর্ষণ। এইরূপ সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবী ও স্বর্গবাসী গ্রহ—জ্যোতিষ্কগণ যে রজ্জুতে বাঁধা আছেন, তাহাও আকর্ষণ ভিন্ন আর কিছু নহে। সূর্য্যের সঙ্গে ঐ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিব্যাদি বাঁধা আছে বলিয়াই সূর্য্যের নাম নাভি।

ইংরাজীতেও চাকার মধ্যস্থ কাষ্ঠকে নেভ Nave বলা হয়। এক্ষণ এই প্রাচীনানুকলি প্রাচীন শব্দটীর প্রতি মনোযোগ করিলেই দেখিতে পাইবেন, ইহার মধ্যে শারীর বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং (নিউটনের আবিষ্কৃত ?) আকর্ষণতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। আমরা এরূপ বহুবিজ্ঞান

পূর্ণ আরও বহুশব্দ প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া চলিল দেখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ঢাকাপ্রকাশে এরূপ বহুশব্দ প্রদর্শন করিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা করি, এত বিজ্ঞানে দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ সমূহ গঠন করা কি মনুষ্য ক্ষমতার অধীন? মনুষ্যদ্বারা অক্ষর কি বৈদিক শব্দ কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই; তবে ইহা কে করিল? সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন,—এই অক্ষর ও শব্দ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্রহ্মা, যিনি এই গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বলিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবাসীর স্রষ্টা,—দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, আদিপুরুষ। তাঁহা হইতে গ্রহ জ্যোতিকাদিক্রমেই মানবগণ ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি-রহস্য। (১)

হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তাগণের সর্ব্বজ্ঞতার প্রমাণ নানারূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সর্ব্বজ্ঞতা যে লৌকিক ক্ষমতার আয়ত্ত নহে—তাহাও নানারূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন যাঁহারা জড় বিজ্ঞানের মহিমায় বিদ্বান্‌নামে পরিচিত, আর্য্যশাস্ত্রে তাঁহারা প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র সর্ব্বথা আর্য্যশাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয়। বিশেষতঃ তাঁহাদের হস্তে রাজক্ষমতা প্রপন্ন হওয়ায় অধীন জাতির মহিমা স্বীকার করা তাঁহারা অপমানজনক মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে যে ২। ৩ ব্যক্তি সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল কারণে এবং প্রকৃত শাস্ত্র

মহস্তজ্ঞ এদেশীয়গণের উপদেশ অভাবে শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, কতকটা বুঝিয়াও তৎপ্রতি আস্থাবান্ হইতে পারেন না। যদি নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিবার চেষ্টা পাইতেন, তবে নানাশাস্ত্রে এমন সকল প্রমাণ পাইতেন, যাহাতে শাস্ত্রকর্ত্তাগণকে কোন ক্রমেই অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেবতা না বলিয়া পারিতেন না; এবং শাস্ত্রোক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রাক্‌ভব লোক সমূহকে আপনাদের আদি পুরুষ না বলিয়া তাঁহারা বানরকে মনুষ্যের আদি পুরুষ বলিতে এত লালায়িত হইতেন না। আমরা গতবার প্রদর্শন করিয়াছি, মনুষ্য দ্বারা ককারাদি অক্ষরের সৃষ্টি কোনক্রমেই হইতে পারে নাই; উহার স্রষ্টা স্বয়ং সর্ব্বস্রষ্টা ব্রহ্মা; এবং উহা চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে বংশ-পরম্পরায় বর্ত্তমান মনুষ্যের আয়ত্ত হইয়াছে। এবার দেখাইব, জ্যোতিষাদির গূঢ় তত্ত্বও মনুষ্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই, উহাও ঐরূপে মনুষ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে সন্‌ডে মন্‌ডে প্রভৃতি বারের নামগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা দ্বারা সূর্য্যের দিন, চন্দ্রের দিন, মঙ্গলের দিন, এইরূপ গ্রহগণের নামানুসারে দিনের নাম হইয়াছে, দেখা যায়। সূর্য্যের এক নাম সূনু; ইংলণ্ডে সূনুর অপভ্রংশ—সন্। সূর্য্যের প্রসবক্ষমতা উপলক্ষ করিয়াই "সূনু" নাম হইয়াছে; অতএব সন্‌বাদী ইংরেজের পূর্ব্ব পুরুষেরাও সূর্য্যকে কোন পদার্থের প্রসবকারী বলিয়া জানিতেন। মনডের মনকে ইংরেজেরা মুন করিয়াছেন। ঋক্‌বেদে চন্দ্রকে "মা" বলা হইয়াছে; তিনি

আকাশ মাপেন, এই জন্য তাঁহার নাম "মা" ইহা ঋক্‌-বেদের কথা। আধুনিক সংস্কৃতে চন্দ্রার্থে শুধু "মা" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না, কিন্তু "চন্দ্রমা" বহুলরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, শুধু চন্দ্র বলিলে যে কর্পূরের প্রতি লক্ষ্য হয়, এবং শুধু মা বলিলে নিষেধ অর্থ হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য চন্দ্র ও মা শব্দের যোগ করিয়া চাঁদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই "মা" শব্দই ইউরোপে "মন্‌" হইয়াছিল। মঙ্গল গ্রহকে টুইষ্ট বলা হয়। সংস্কৃতের উজ্জ্বলার্থক ত্বিষ ধাতু হইতে ত্বিষ্ট শব্দটী গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বুধ গ্রহ সূর্য্যের খুব নিকটে নিকটে থাকে বলিয়া আধুনিক লোকের শুধু চক্ষে তাহা বড় পরিলক্ষিত হয় না, এই জন্যই বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে ওয়েডনেস ডে হইতে বুধের অস্তিত্ব তিরোহিত হইয়া থাকিবে। বৃহস্পতি যে কালে জুপিটর রূপে গ্রীকদিগের প্রধানতম উপাস্য পদ লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে মাত্র একটী বারের আধিপত্যে না রাখিয়া বিশেষ আধিপত্য প্রদান করা হইয়াছিল; তাঁহার বার থারষ্টের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শাস্ত্রের উশনস্‌ গ্রীকে বীনস্‌ হইয়াছিলেন; তিনিই ফ্রায়া কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার বারটী ফ্রায়ার নামানুসারে ফ্রাইডে হইয়াছে। শাস্ত্রের শনৈশ্চর গ্রহ ইউরোপে সেটার্ণ নাম পাইয়া সেটার্ডের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। বাইবেলের ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তান এবং আমাদের শুভ কার্য্যের বিঘ্ন স্বরূপ শনি ঐ সেটার্ণ বা শনৈশ্চর গ্রহেরই নামান্তর।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের নাম

হইতে ঐ সকল মাস যে সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম স্থানীয় ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ঐ হিসাবে মার্চ্চ মাসে বৎসরের আরম্ভ হইত। মার্চ্চ ও বৈশাখের সঙ্গে অয়নাংশ পরিবর্ত্তন জনিত ভিন্নরূপে গণনাহেতু এখন যে কয়েক দিন অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মার্চ্চ ও বৈশাখ ঠিক একদিনে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় তত কঠিন নহে। আমরা বিবেচনা করি, বৎসরের প্রথম গতি আরম্ভ বলিয়াই গত্যর্থে মার্চ্চ মাসের নাম হইয়াছে। যে হউক, এই মার্চ্চ মাস বহুকাল বৎসরের প্রথম গণ্য হইত, তৎপরে ইউরোপের কোন প্রবল ব্যক্তিদ্বারা জানুয়ারি মাস প্রথম গণ্য হইয়াছে। জানুয়ারী শব্দের একটী গূঢ় অভিপ্রায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সিংহকে জানোয়ার বলা হয়। যখন মার্চ্চ বৈশাখ মাসে হইত, তখন ফাল্গুন মাসে জানুয়ারি হইত। যে মাসে পূর্ণিমার দিন চন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই মাসের নাম ফল্গুনীর নামানুসারে ফাল্গুন হয়। ফল্গুনী সিংহ রাশির মধ্য নক্ষত্র। অতএব যে কারণে ফল্গুনীর নামানুসারে ফাল্গুন হয়, সেই কারণে সিংহের নামান্তর জানোয়ার হইতে জানোয়ারি মাসের নাম হওয়া খুবসম্ভবপর।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা বুঝিতেপারিতেছি, ভারতবর্ষে ও গ্রীকাদি প্রাচীন দেশে একই প্রকার বার মাস প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারাই বার ও মাসাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষে যেমন রাশি নক্ষত্র প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, ইউরোপেও পূর্ব্ব-

কালে তদ্রূপ ছিল। এই সকল বিষয় হইতে এই উভয় জাতীয় লোক যে এক পূর্ব্বপুরুষ হইতেই ঐ সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। রাশি নক্ষত্র প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ক ধারণা যদিও উভয় জাতির প্রায় একইরূপ তথাপি কোন কোনটি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই মতভেদের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় জাতির পূর্ব্বপুরুষেরাই নিজে নিজে ঐ গ্রহ জ্যোতিষ্কগণের আকৃতি প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া যদি একে অন্যের নিকট শুনিয়া লইতেন, তবে এই মতভেদ হইত না; কিন্তু নিজে দেখিয়া মতভেদ হওয়ার কারণ আছে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; নক্ষত্র মণ্ডল যে সাতাইশ অংশে বিভক্ত, তাহার প্রকৃতি প্রত্যেক অংশে এক এক প্রকার; অন্য পদার্থের সংযোগ বিয়োগে ঐ আকৃতি প্রকৃতির রূপান্তর হইতে পারে। প্রত্যেক অংশের প্রকৃতি যে বিভিন্ন তাহা ফলিত জ্যোতিষের কার্য্য দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষিত। ঐ অংশগুলি এক একটি নক্ষত্র নামে পরিচিত। যে অংশ অশ্বের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, তাহা অশ্বিনী নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়। এইরূপ অন্যান্য নক্ষত্রের নাম কতক আকৃতি ও কতক প্রকৃতি অনুসারে হইয়াছে। কিন্তু সেই আকৃতি গুলি এখন কেহই দেখিতে পায় না। এখন প্রত্যেক অংশে বহু সংখ্যক তারা দেখা যায় মাত্র; কিন্তু কেবল ঐ তারাগুলি দ্বারা কোন আকৃতি হয় না। বিশেষতঃ ঐ নক্ষত্রগুলির সওয়া দুইটিতে যে এক একটি রাশি হয়, তাহাও মেষ বৃষ প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি

বিশিষ্ট, অথচ এখনকার লোকে কোন আকৃতিই দেখিতে পায় না। বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য ও ধুমকেতুর ন্যায় বাষ্পীভূত পদার্থগণ দ্বারা ঐ নক্ষত্র ও রাশিগুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক লোকের তাঁহা দেখিবার অযোগ্য হইয়াছে।

আধুনিক লোকের ন্যায় যদি পূর্ব্বকার লোকেও উহা না দেখিতেন, তবে জ্যোতির্ষ শাস্ত্রই প্রচলিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এখন পূর্ব্বতন জ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া নুতন প্রকার জ্যোতিষের প্রবর্ত্তনা হওয়া খুব সহজ। এখন যদি প্রাচীন নক্ষত্রমণ্ডল অগ্রাহ্য করিয়া জ্যোতিষগণনার ভিন্নরূপ উপায় করা হয় তাহা অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু যখন জ্যোতিষের কোন উপকারিতা লোকে বুঝে নাই; যখন একটী নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্যটির দূরতাদি গণনা করার উপায় ছিল না, তখন কিজন্য কি উপায়ে জ্যোতিষ গণনা আরম্ভ হইল? বলা বাহুল্য যাহাদের জ্যোতিষে জ্ঞান নাই, তাহারা গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থানের যে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। আজও যেমন তাহারা সহস্র সহস্র নক্ষত্রে আকাশ পরিশোভিত দেখে; ছয় মাস পরেও সেইরূপই দেখিবে। যাহা নিত্য একইরূপ, তাহারই মধ্য হইতে যে ২।০১টী গ্রহ কিছু কিছু সরিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের এমন কিছু মাথা ব্যাথা হইতে পারে না, যে জন্য জ্যোতিষের ন্যায় অতীব কঠিন গণনা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।" আরও আশ্চর্য্য; "ইউরোপে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে জ্যোতিষের অনেক কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে থাকা প্রমাণিত হয়। খৃষ্ট জন্মিবার ছয়-

শত বৎসর পূর্ব্বে যে পিথাগোরস ও এনেক্সিমেন্দর প্রভৃতি দ্বারা ইউরোপীয় জ্যোতিষের প্রথম আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষ গণনার ফল স্বরূপ মাস ও বার প্রভৃতি তথায় প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্যোতিষ গণনা দ্বারা আগে রাশি নক্ষত্র ঠিক না হইলে বার ও মাষের নাম করণ হইতে পারে নাই। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, গ্রীসাদি দেশের আদিপুরুষেরা অন্য কোন দেশ হইতে বার, মাস গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতির সংস্কার লইয়া গিয়াছিলেন।

যে বেদ অস্মের্ষ্যমান্ কালের প্রাচীন হইলেও নব্যমতে অন্যুন চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, সেই বেদ জ্যোতির্বিজ্ঞান লব্ধ গ্রহ, নক্ষত্র তিথি, বার, মাস ঋতু প্রভৃতি কথায় পূর্ণ। হিন্দুর জ্যোতিষ যে সেই বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন, তাহা এতদ্দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যে দেশের এত প্রাচীন বেদেও জ্যোতিষের কথা রহিয়াছে, গ্রীক প্রভৃতি জাতি সম্ভবতঃ সেই দেশ হইতেই জ্যোতিষ মূলক গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্কার লইয়া গিয়াছিলেন। আমাদমতে ভারতবর্ষ হইতেই সমস্ত দেশে মনুষ্য জাতি অধ্যুষিত হইয়াছে। অতএব গ্রীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে থাকিবার কালেই জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা রাখিতেন বলা যায়। গ্রীসাদি দেশে যাইয়া তাঁহাদের অধস্তন পুরুষেরা দীর্ঘকালে জ্যোতিষ গণনা ভুলিয়া গিয়াছিল; এবং গ্রহ নক্ষত্র মাস প্রভৃতির স্মৃতি পুরুষ পরম্পরায় রক্ষা করিয়াছিল। মাস বর্ষাদি গণনার জন্য যে সামান্য রূপ জ্যোতিষ প্রচলিত ছিল তাহাই অব-

লম্বন করিয়া পিথাগোরস প্রভৃতি জ্যোতিষের কতকটা সংস্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিশ্চক্র নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণনা প্রণালীরও রূপান্তর করিতে হয়; এইরূপ রূপান্তর অবস্থায় পরবর্ত্তী কালে গ্রীস ও রোমে যে জ্যোতিষ গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ভারতীয় জ্যোতিজ্ঞগণ আপনাদের নানাবিধ গণনা প্রণালীর সঙ্গে উহাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্ত্তন সহকারে গণনা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও জ্যোতিষ গণনার নূতন সৃষ্টি কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক হওয়ার প্রমাণ নাই। এত বড় একটা কাজ যিনি করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য হইলে, জ্যোতিষ গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম নিশ্চয়ই থাকিত। বস্তুতঃ মনুষ্যকুলে কেহ সে যশের অধিকারী নহে, এজন্যই জ্যোতিষ গণনার স্রষ্টা বলিয়া কোন মনুষ্যের নাম নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম কার্য্যাদি ব্যতীত বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকায় মনুষ্য দ্বারা জ্যোতিষের ন্যায় নীরস, দুর্জ্ঞেয়, বহুকাল-বহুপরীক্ষা সাপেক্ষ বিষয়ের উদ্ভাবনা হওয়া অসম্ভব। রাশি নক্ষত্রাদির যে আকৃতি প্রকৃতি মনুষ্য সহসা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তাহা মনুষ্য দ্বারা মিছামিছি কল্পিত হওয়ারও কোন কারণ নাই।

অতএব স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যে ব্রহ্মা সকল বিদ্যার উদ্ভাবন কর্ত্তা, সকল পদার্থের স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, তিনিই জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। জ্যোতিশ্চক্রের কোন্ অংশে কোন্ পদার্থ কোন্ প্রকৃতি প্রকাশ করিতেছে, তিনি তাহা অবগত আছেন। তাঁহারই উপ-

দেশ ও নিজ নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঋষি ও গ্রহ উপাহিত জ্যো-তিষগণ দ্বারা মনুষ্য বংশে প্রচারিত হইয়াছে। জ্যোতিষ সৃষ্টি করা যখন মনুষ্য ক্ষমতার অধীন নহে, তখন ঐ জ্যোতিষ রূপী ঋষি কিম্বা সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক মনুষ্য লোকে জ্যোতিষ প্রচার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

সৃষ্টি-রহস্য। (১০)

যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই যে সমস্ত পদার্থের জ্ঞাতা, তাহা বলা বাহুল্য। সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাদিগকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও সেই স্রষ্টার জ্ঞান অনেক পরিমাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। স্রষ্টা যদি নিরাকারও হইতেন, তথাপি তাঁহার প্রথম সন্তানকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী জ্ঞান প্রদান করিতে তিনি বাধ্য হইতেন। স্বভাবতই পুত্রগণ পিতার গুণ কতক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ অপেক্ষা আমরা যাহাদের উদ্দেশে এত কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি, তাহাদের নিকটে বাইবেলের দৃষ্টান্তটাই কিছু হৃদয়গ্রাহী। অতএব আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা বাইবেলে দেখিবেন; খৃষ্টাক্ষরে রহিয়াছে; খৃষ্টানের নিরাকার "ঈশ্বর নিজের প্রতিকৃতিতে আদমকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" সাকার মানব পিতা আদমের প্রতিকৃতি ঈশ্বর নিরাকার কিমা, সে বিচার এখন আমরা করিব না। কিন্তু পুত্রটি যে পিতার মত, ঐ কথায় একথা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর আদমকে যে অনেক বিষয়ে

উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বাইবেলে পাওয়া যায়। আদম জন্মিয়াই যে কথা বলিতে পারিয়াছে; নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে তাহা অগ্রাহ্য হইলেও বাইবেলে আছে। বাইবেলে জগতের সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেও সোম, মঙ্গল প্রভৃতি বার থাকার উল্লেখ আছে। যখন সোম মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ জন্মেন নাই, তখন সোম মঙ্গলাদি বার কিরূপে হইল এবং সূর্য্য জন্মিবার আগে দিন রাত্রিইবা কিরূপে হইল, সে মীমাংসা খৃষ্টানেরা করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আমরা তাহা করিতে পারি। যে হউক যখন এখনও পুত্রকে পিতার অনেক গুণ পাইতে দেখা যায়, তখন আদি স্রষ্টার পুত্র যে তাঁহার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা জগতের সমস্ত পদার্থের আদি সমষ্টি। তাঁহার সেই প্রকাণ্ড অবয়ব হইতে নানা জাতীয় অণু বহিষ্কৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু অবয়বে পরিণত হইয়াছে। যে সকল পদার্থে মনুষ্য গঠিত হইয়া বুদ্ধিজীবী হইয়াছে, সে সকল পদার্থ ঐ ব্রহ্মা এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন ঐ অবয়ব গুলিতেও ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিজীবী বলাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে মনুষ্যের আগে সৃষ্টি হইয়াছে, বিজ্ঞানেও এই কথা বলে। তাঁহাদের যে বুদ্ধি বৃত্তি নাই, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। আমরা পরে দেখাইব, ক্ষুদ্র একটি পরমাণুরও যখন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তখন সেই পরমাণুগণ যে প্রকারেই অবয়ব গঠন করুক, তাহাদের বুদ্ধি অবশ্যই থাকিবে। মনুষ্য যে প্রকার

কার্য্যে বুদ্ধি খাটায়, অন্য পদার্থ হয় ত তাহার অন্য প্রকারে বুদ্ধি খাটাইতেছে; মনুষ্য তাহা কিরূপে বুঝিবে? এখন অনন্ত প্রকার পদার্থ হওয়াতে আমরা সকল প্রকার পদার্থ দেখি না, সুতরাং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে পারি না, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে যখন এত পদার্থ জন্মে নাই; তখন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেন। লোক বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করে। যে চন্দ্র সূর্য্যাদি অতি পূর্ব্বকালে জন্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমকালিক পদার্থগণকে চিনেন; এবং তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনে যে সকল পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদিগকেও চিনেন; সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্বাভিজ্ঞ হইবেন, এবিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়াই যে মনুষ্যের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার কয়েকটি প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণেও একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিব।

আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। যে বিশ্বামিত্রের এক পুত্র মধুচ্ছন্দ ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত প্রকাশক ঋষি, সেই বিশ্বামিত্রেরই অপর পুত্র সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ গুরু ধন্বন্তরির নিকটে ভৈষজ্য শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ সেই উপদেশ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাই সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের শীর্ষ স্থানীয় গ্রন্থ। বলা বাহুল্য ধন্বন্তরি নিজে ঐ সকল গ্রন্থোক্ত ঔষধ সমূহের গুণ আবিষ্কারক ও শারীর যন্ত্রাদির প্রথম নির্ণয় কর্ত্তা নহেন;

ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্রাদিক্রমে যে ঐ আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় উপদেশ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র সমূহে পরিষ্কার রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা ঔষধ সমূহের গুণ যে কত প্রাচীনকাল হইতে লোক সমূহে পরিজ্ঞাত হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই উপলব্ধি হইবে। কোন মনুষ্য কর্তৃক যে ঔষধ সমূহের গুণ ও শারীর যন্ত্রাদির ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই; হইলে যে সেই মনুষ্য নিজের এই অসাধারণ কীর্ত্তি গোপন রাখিতেন না; দুই এক বা শত সহস্র লোকদ্বারাও যে সহস্র সহস্র ঔষধের গুণ নূতনরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারে না, চিন্তাশীল ব্যক্তির তাহা সহজেই অনুমেয়। অধুনা নানা যন্ত্রের নুতন আবিষ্কারসহ পদার্থ সমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার উপযোগী কত উপায় অবলম্বিত হইতেছে কিন্তু এতদ্বারা কয়টা ঔষধের নূতন গুণ আবিষ্কৃত হইল—যাহা পূর্ব্বে কোনপ্রকার ঔষধরূপে পরিচিত বা ব্যবহৃত ছিল না? বস্তুতঃ যদি এই নব বিজ্ঞানের বহু আড়ম্বর সময়ে কোন ঔষধ নূতন-রূপে আবিষ্কৃত হওয়া এত কঠিন কার্য্য হয়, তবে যখন এই সকল যন্ত্র ছিল না তখন কেবল মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা সেই সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল।

কুইনাইন বৃক্ষের জল পান করিয়া মনুষ্য যেরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে তদ্রূপে কালে কস্মিনে দুই একটা ঔষধের আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ঐ প্রণালীতে সেই অতি পূর্ব্বকালে যখন লোক সংখ্যা অতি বিরল ছিল, নব্যমতে লোকসমূহ অসভ্য ছিল—কৃষক দ্বারা বেদ সৃষ্টি হইত, সেই কালে মনুষ্যদ্বারা সহস্র সহস্র ঔষধের আবিষ্কার হওয়া অস-

গুণ। বিশেষতঃ কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা ঐরূপে সহসা আবিষ্কৃত হইতেই পারে না, যেমন পারদ। নব্য বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রাদি দ্বারা সকল জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, পারা খাওয়াইয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু এত পরীক্ষার পরেও পারার গুণ তাঁহারা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কোন ডাক্তর কোন একটী রোগে পারাকে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, আবার অন্য ডাক্তর সেই রোগেই পারাকে ভয়ানক অপকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। যাহার গুণ সম্বন্ধে বহুকাল হইতে এত পরীক্ষার পরেও ডাক্তারগণ নিঃসন্দিগ্ধ নহেন সেই পারাকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অধিকাংশ ঔষধে প্রয়োগ করিয়া অনন্তকাল হইতে অসাধারণ উপকার লাভ করিয়া আসিতেছেন। এত পরীক্ষার পর ডাক্তারগণ পারাকে যে গুণ সম্পন্ন মনে করেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকর্ত্তা পারার যদি তদতিরিক্ত গুণ অবগত না থাকিতেন এবং সেই গুণ অবগত না থাকিয়া অন্যরূপ ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিতেন, তবে ডাক্তরদিগের আশঙ্কিত পারা ঘটিত রোগে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় মনুষ্য বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইত; যেহেতু ঔষধের সঙ্গে পারা না খাইয়াছে, ভারতে এমন মনুষ্য নাই। বলিলেও চলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সঙ্গে পারা খাইয়া ভারতে কেহই কখনও পারা ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয় না; অধিকন্তু অসাধারণ উপকার লাভ করিয়া থাকে। যে পারার কার্য্য স্বভাবতঃ অতীব ভয়ানক; যাহার ক্রিয়া সুদীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পায়; যাহার গুণ

ডাক্তারগণ অদ্যাপি অবধারণ করিতে পারিলেন না ; সেই পারাকে এত উপকারী পদার্থে পরিণত করা কখনই মনুষ্য ক্ষমতার আয়ত্ত হইতে পারে না।

পারার ন্যায় স্বর্ণ মুক্তা প্রভৃতি—যে সকল পদার্থের গুণ সুদীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পায়,—ডাক্তারগণ অদ্যাপি তাহা ঔষধ রূপে প্রয়োগ করিতে সাহসী নহেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে সেই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ঐ স্বর্ণ মৌক্তিকাদিকে ঔষধ-রূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যে হলাহল বিষ সদ্য প্রাণ হন্তারক, সেই বিষকে মনুষ্যের উপকারার্থ প্রয়োগ করা কি সহজ কথা ? এখন যে ডাক্তারগণ ঔষধার্থে বিষপ্রয়োগ করেন তাহা পূর্ব্ববর্ত্তীগণকর্ত্তৃক ঔষধার্থে বিষপ্রয়োগের উপকারিতা দেখিয়াই করা হইতেছে। অন্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে বিষের কার্য্য যে অমৃতের ন্যায় হইতে পারে—ডাক্তারগণ এতত্ত্ব নিজে আবিষ্কার করেন নাই। সুধু বিষ খাইয়া কাহারও কোন উপকার হইতে দেখিলে বরং বলা যাইত যে হঠাৎ বিষ ভক্ষণের উপকারিতা দেখিয়াই বিষপ্রয়োগ করিতে লোকে সাহসী হইয়াছে ; কিন্তু বিষ স্বভাবতঃ সকল কালেই মারাত্মক। ইহাকে অন্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলেই অবস্থা বিশেষে অমৃতের কাজ করে। একমাত্র বিষ যদিও হঠাৎ প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব না হউক, কিন্তু পৃথিবী ভরা কত জিনিস থাকিতে, কে জিনিসটীর সঙ্গে মিলিলে বিষ অমৃত হইবে, তাহাই হঠাৎ মিশিয়া উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ হওয়া সম্ভবপর নহে।

যে সকল রোগ ঔষধ প্রয়োগে বহুকালে অল্পে অল্পে আরো

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সকল রোগের ঔষধ সম্বন্ধে হঠাৎ আবিষ্কারের অনুমান খাটিতেই পারে না। বাতব্যাধি প্রভৃতির আয়ুর্ব্বেদীয় অধিকাংশ ঔষধ সুদীর্ঘকালে ফলপ্রসব করে। তাহা বহুপ্রকার পদার্থের মিশ্র, এবং তাহা বহুদুর্ম্মূল্য বহু দুষ্প্রাপ্য পদার্থগণ যোগে বহুকালীন বহুযত্নে প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ ঔষধের উপকারিতাও যে অসাধারণ, তাহা এদেশে নিত্য পরীক্ষিত হইতেছে। যে সকল কঠিন পীড়া বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ কোন ক্রমেই আরোগ্য করিতে পারেন না, ঐ সকল ঔষধের গুণে কবিরাজেরা প্রায়শঃ তাহা আরোগ্য করিতেছেন। ডাক্তারগণ আপনাদিগকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু যে সকল ঔষধের কার্য্য ঐরূপ সুদীর্ঘকাল পরে পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়, এমন কোন ঔষধ তাঁহারা নিজে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ঐরূপ ঔষধ যদি মনুষ্যদ্বারা আবিষ্কৃত হইত, তবে এত দেখিয়া শুনিয়া,—পরের নিকটে সকল জিনিসের গুণ অবগত হইয়াও সেরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাঁহারা পারেন না কেন? বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় শত সহস্র প্রকার ঔষধ মনুষ্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নহে; কোন মনুষ্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সমস্তকে আপনার আবিষ্কৃত বলিতে সাহসীও হয়েন নাই; আয়ুর্ব্বেদীয় বিভিন্ন মতের সমস্ত গ্রন্থেই দেখা যায়, "কোন কোন ঔষধ ব্রহ্মার আবিষ্কৃত; ব্রহ্মা হইতে দক্ষপ্রজাপতি (সাতাইশ নক্ষত্রের জনক—মানুষ নহে) দক্ষ হইতে সূর্য্য পুত্র অশ্বিনীকুমার দ্বয়; অশ্বিনীকুমার হইতে চন্দ্র সূর্য্য প্রমুখ দেবগণের রাজা ইন্দ্র; ইন্দ্র হইতে ধন্বন্তরি ও ধন্বন্তরি হইতে সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং কোন কোন ঔষধ মহাদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।" শাস্ত্রসমূহের এই উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত জ্ঞানীবর্গ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং অবিশ্বাস করায় অবিবেচনা প্রকাশ পায় মাত্র।

সৃষ্টি-রহস্য। (১১)

যাহারা "ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজমান" বলিয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছে, তাহারাই আবার প্রত্যেকটি পরমাণুতে, জল বায়ু চন্দ্র সূর্য্য গাছ পাথর প্রভৃতি কোন পদার্থে ঈশ্বরত্ব থাকা বিশ্বাস করে না; যে সকল কলির কুষ্মাণ্ড "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া আপনাকে বেদজ্ঞ মহর্ষি নামে আখ্যাত করিতে লজ্জিত নহে, তাহারাই আবার সমস্ত পদার্থ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য ও মনুষ্যাদি কতিপয় প্রাণীব্যতীত সমস্ত পদার্থকে জড়নামে অভিহিত করিয়া অদ্ভুত বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে! ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু কোন পদার্থে নাই; তিনি শূন্যে নাই সুতরাং শূন্য রূপে ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন না, বায়ুতে নাই, সুতরাং বায়ুরূপে ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন না; অগ্নি, জল, ভূমি, গাছ, পাথর, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি কোন পদার্থে তিনি নাই, সুতরাং ইহার কোন পদার্থরূপেই তিনি ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন না; ইহা কি নিতান্তই অদ্ভুত যুক্তি নহে? সর্ব্বত্র আছেন, অথচ কোন পদার্থে নাই, ইহা কি সম্ভবপর না স্বার্থক উক্তি? কিন্তু ঘোর কলিকাল বলিয়াই এরূপ বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবসমূহ ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া

ছেন; এবং হিন্দুর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধিকে নষ্ট করিবার জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। যে সর্ব্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মনুষ্যরূপে বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি চন্দ্রসূর্য্য জল বায়ু প্রভৃতিরূপে কেন যে সেই বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ করিতে পারেন না; সে উত্তর কোন নবধর্ম্মপ্রচারকের নিকটে পাওয়া যায় না। যে জল বায়ু প্রভৃতি মনুষ্য শরীর রূপে পরিণত হইয়া বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ করিতে পারে, তাহারা নিজে নিজে কেন সেই বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না? যে সকল পদার্থ মনুষ্যের উপাদান তাহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির উপাদান হইয়াও যে কেন চন্দ্র সূর্য্যাদিকে বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন করিতে পারে না, সে উত্তর কোন ক্রমেই নব্যগণ নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথচ কলির মহাপ্রভাবে দেবতায় জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট নব্যগণ নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী!

জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট নব্যগণকে জল, বায়ু, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের বুদ্ধিমত্তাদি বুঝান অতীব কঠিন; তথাপি আমরা ২। ১টি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের ভ্রম দূরীকরণে সচেষ্ট হইলাম। এখানে একটি কথা পাঠককে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। যে জড়শক্তি চন্দ্র সূর্য্যাদি অন্যান্য পদার্থে পরিলক্ষিত হয়, তাহা মনুষ্যেও কার্য্য করিতেছে। জড়শক্তি বশেই মনুষ্য পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিতে পারে না; দ্রুতগামী গাড়ী হইতে যে নিজ ইচ্ছা মত স্থানে নামিয়া দাঁড়ান যায় না, তাহার কারণও মনুষ্যের জড়ত্ব। কিন্তু ইত্যাদি জড়ত্ব সত্বেও মনুষ্য যেমন ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে,

তদ্রূপ অন্যান্য পদার্থে জড়ত্ব পরিলক্ষিত হইলেও তাহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখা যাইতে পারে,—লবণ, চিনি প্রভৃতি কতিপয় পদার্থকে নিষ্পেষিত করিয়া জলে মিশাইলে তাহারা আপনাপন স্বজাতি সঙ্গে মিলিয়া থাকে। তাহাদের সজাতীয় মিলনে যে সকল দানা গঠিত হয়, তাহা লবণ চিনি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লবণের যতগুলি দানা প্রস্তুত হইবে, প্রত্যেকেই আট কোণবিশিষ্ট হইবে; চিনির সমস্ত দানাগুলিই ছয় কোণবিশিষ্ট হইবে; এইরূপ অন্যান্য পদার্থ বিশেষ বিশেষ আকারবিশিষ্ট হয়। কেন এরূপ হয়, ইহা কি ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় না? ঐ পদার্থগণের যদি ইচ্ছা ও বিবেচনা শক্তি না থাকিত, তবে জড় ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট হইতে পারিত না। কেন্দ্রস্থল হইতে সকল দিকেই সমান আকর্ষণশক্তি প্রযুক্ত হয়; সুতরাং সেই পরস্পর আকর্ষণশক্তিতে যে দানাটি গঠিত হইবে, তাহাকে গোলাকার হইতে হইবে। জড়শক্তি কোন ক্রমেই ছয় কোণ বা আট কোণ করিতে পারেনা; না পারিবার কারণ আমরা প্রদর্শন করিতেছি। আণুবীক্ষণিক দানাগুলি সম্বন্ধে পাঠকের মনোযোগ সহজে নিবিষ্ট হওয়া কঠিন বিবেচনায় আমরা স্থূল পদার্থ দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যে পদার্থ অষ্ট কোণবিশিষ্ট, তাহার আকার একটি বাক্সের ন্যায় হইবে। একটি বাক্সের মধ্যবিন্দু হইতে বাক্সের ছয় পার্শ্বের ছয়টি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বিন্দুর যত ব্যবধান, আটটি কোণ তদপেক্ষা বহু

ব্যবস্থিত। কেন্দ্র হইতে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী সেই স্থানে আকর্ষণ বল অধিকতর রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এবং যতই দূরবর্ত্তী হয়, সেই পরিমাণে আকর্ষণের বল কমিয়া যায়। অতএব কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি বশতঃ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন পরমাণুগণ নিকটবর্ত্তী পার্শ্ববিন্দুতে যাইতে থাকিলে কোন ক্রমেই কোণ গঠিত হইতে পারে না। অতএব পরমাণুগণ যদি স্বধু জড়শক্তি বলে দানা বান্ধিত, তবে সকল জাতীয় পদার্থের দানাই গোলাকার ভিন্ন অন্য কোন আকার ধরিতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা ও বিবেচনা শক্তি আছে বলিয়াই সজাতীয় আকার ধরিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক আকর্ষণ বলকে অতিক্রম করিয়া কোণ গঠন করিতে পারে। কোণ গঠন কার্য্যে সেই পরমাণুগণের পরস্পরে পরামর্শ করাও আবশ্যক হয়; কেননা কোন্ পরমাণুটির পরে কোন্ পরমাণুটি কোন্ দিকে বসিলে কোণ গঠন হইবে, ইহা তাহারা ঠিক না করিয়া যদি সকলেই যার যার মতে বসিতে যায় তবে কে কোথায় বসিবে স্থির না থাকায় কেবল এদিক্ ওদিক্ করিয়া সেই পরমাণুগণকে দৌড়িতে হয়। আমাদের এই উক্তির সত্যতা অবধারণ করিতে চিন্তাশীল পাঠকগণকে বিশেষ মনোযোগ প্রদানে আমরা অনুরোধ করি। তাঁহারা অণুবীক্ষণ সাহায্যে দানা বান্ধিবার পদ্ধতি যদি পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং তৎসঙ্গে বিশেষ বিবেচনা প্রযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই পরমাণুগণের বুদ্ধি বিবেচনা ও পরামর্শ করিবার ক্ষমতা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না।

স্থূলরূপে শূন্য বায়ু জল প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়াও বিবে-

চক ব্যক্তি উহাদের বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি অনুভব করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে শূন্যের একটী ইচ্ছাশক্তি ও বলের পরিচয় দিয়াছি। বায়ু জল প্রভৃতি পদার্থগণের জাতীয় আকর্ষণকে পরাভব করিয়া শূন্য যে নিজ বলে প্রয়োজনানুসারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। বায়ুর ক্ষমতা-সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। নব্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, নদ্যাদির জলে কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু অবস্থান করে, জলস্থ মৎসাদি প্রাণীবর্গ সেই বায়ুদ্বারা জীবন রক্ষা করে। সমুদ্রাদির গভীর জলে উপরিস্থিত জল অপেক্ষা নিম্নবর্ত্তী জল অতিশয় ঘন। সেই নিম্নবর্ত্তী জলে বায়ুর অংশ নিতান্ত বিরল বশতঃ তথায় মৎস্যাদি বাস করিতে পারে না। জল ঘন ও পাতলা বলাতে এই বুঝা যাইবে যে, যদি এক ঘনহস্ত স্থানে উপরিস্থ পাতলা জলে ৫ লক্ষ কোটি জলীয় পরমাণু থাকে তবে নিম্নবর্ত্তী ঘন জলে ৬ লক্ষ কোটি জলীয় পরমাণু থাকিবে। সুতরাং উপরিস্থ জলে যদি ৩ লক্ষ কোটি বায়ু পরমাণু থাকে, তবে নিম্নবর্ত্তী ঘন জলে ২ লক্ষ কোটি বায়ু পরমাণুর অধিক থাকিতে পারে না। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, যে জলে বায়ু পরিলক্ষিত হয় না, তন্মধ্যে কিরূপে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া জলীয় জন্তুগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে। স্বভাবতঃ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে বায়ুর নিম্নে জল অবস্থান করিবে; এবং জাতীয়াকর্ষণ প্রভাবে জলীয় পরমাণুগণ পরস্পর মিলিয়া থাকিবে; পক্ষান্তরে জড় ধর্ম্মানুসারে জাতীয়াকর্ষণ জলে বায়ুও বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া থাকিবে; কিন্তু নিম্নের সেই জাতীয় আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন

করতঃ বায়ু কিরূপে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়? এবং যে বায়ু স্বভা-বতঃ উপরে থাকিতে বাধ্য, সে জলের সেই প্রবল জাতীয়া-কর্ষণকে ছিন্ন করতঃ বলপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় কিরূপে? জলের উপরিস্থ বায়ু ও জলমধ্যবর্ত্তী বায়ু একই জাতীয় পদার্থ; একই জাতীয় পদার্থের গুণ একই প্রকার। জলমধ্যে প্রবেশ করা যদি বায়ুর গুণ হইত, তবে আকাশের সমস্ত বায়ুকেই আমরা জলমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিতাম। কিন্তু সাধারণ বায়ুর ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া জল জন্তুদিগের প্রয়োজনানুরূপ কতক বায়ু জলমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে কি ইহাই প্রতীতি হয় না যে, প্রাণীদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিবার জন্যই বায়ু দেবতা আপ-নার উপচিকীর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন?

কোন রুদ্ধগৃহে বহুলোক অবস্থান করাতে নিঃশ্বাসবায়ুতে গৃহটি পূর্ণ। নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্ব্বণ থাকায় স্বাভাবিক বায়ু অপেক্ষা তাহা ভারী। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভারী পদার্থকেই অধিক বলে ধরিয়া থাকে, সুতরাং সেই গৃহস্থিত কার্ব্বণ বিশিষ্ট বায়ু গৃহেই স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ। বা-হিরে বাতাস বহিতেছে-না, সে অবস্থায় জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা বাতাসের নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়ন দ্বারা বায়ু হুহু করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে, এবং আপনার অপেক্ষা ভারী সুতরাং বলবান্ থাকা সত্ত্বেও গৃহস্থিত বায়ুকে ঘাড় ধরিয়া বাহির ক-রিয়া দিতেছে। গৃহস্থিত লোকদিগকে বাঁচান জন্যই যে বায়ুর এই অসাধারণ চেষ্টা, তাহা কি উপলব্ধি হয় না? নতুবা বাহিরের বসতি পরিত্যাগ করিয়া মাধ্যাকর্ষণের বল অতি-

ক্রম করতঃ সেই বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে ঠেলিয়া ঘরে আসে কেন ? আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে গৃহে কোন প্রাণী অবস্থান করে না, সে গৃহে বায়ুর ওরূপ গতিবিধি নাই ; সে গৃহে ক্রমে ক্রমে দূষিত বায়ুই সঞ্চিত হইয়া থাকে ; অব্যবহৃত রুদ্ধ গৃহে সহসা প্রবেশ করিলে যেন ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। বায়ুর এইরূপ ব্যবহারে তদীয় অসাধারণ প্রাণীহিত চেষ্টা ও অসাধারণ ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক জাতীয় পদার্থের গুণ অন্য জাতীয় পদার্থের বুঝিয়া উঠা যদিও কঠিন, তথাপি আমরা শূন্য, বায়ু প্রভৃতি জগতের উপাদান পদার্থ গুলির গুণ এইরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি। একমাত্র পরমাত্মাই শূন্যরূপেশূন্যের কর্ত্তব্য, বায়ুরূপে বায়ুর কর্ত্তব্য, মানুষরূপে মানুষের কর্ত্তব্য ও অন্যান্য অনন্ত পদার্থরূপে অনন্ত প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, সুতরাং কোন পদার্থই অশ্রদ্ধাভাজন নহে, কোন পদার্থই ঈশ্বরত্ব পরিশূন্য নহে। বরং যে পদার্থ অধিক প্রাচীন, তাহার অভিজ্ঞতা অধিক,—সারবত্তা অধিক ; যে পদার্থ যত বৃহৎ, তাহার ক্ষমতা তত অধিক। চন্দ্র সূর্য্য জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থগণ অতি প্রাচীন ও অতি বৃহৎ-অবয়ববিশিষ্ট ; এবং তাঁহারাই অপ্রাচীন পদার্থগণের নিদান ও উপাদান স্বরূপ। ঐ প্রাচীন পদার্থগুলি অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন। ঐ চন্দ্র সূর্য্যাদি অতি প্রাচীন পদার্থগণের অসাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহাদের সন্তান মানবগণ মনুষ্যোচিত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্যাদির স্বরূপ মানবস্বরূপের বিসদৃশ

হইলেও, যে বিজ্ঞান জলের শেওলা হইতে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে মানবরূপ সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনুমান করে, সেই বিজ্ঞান চন্দ্র সূর্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বর্ত্তমান মনুষ্য-রূপ সৃষ্টি হওয়ার বহুল প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বরং আমরা আশা করি, বিজ্ঞান যদি চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে মানবোৎপত্তিরূপ ক্রমাবনতির পথ অনুসন্ধানে প্রযুক্ত হয়, তবে এই পথ অতি সহজে আবিষ্কৃত হইবে। এই পথে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য আমরা এবার সংক্ষেপেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম, এতদ্দ্বারা বানরত্ব অপেক্ষা দেবত্বের দিকে লোকের রুচি প্রবৃত্তি কতদূর অগ্রসর হয়, তাহার পরি-চয় পাইলে আমরা ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

দেবতা-রহস্য। (১)

দেবতা রহস্য বুঝা ও বুঝান, উভয়ই কলিকালে বড় কঠিন; কিন্তু কঠিন হইলেও যে যতদূর পারে, বুঝিবার চেষ্টা করিলে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারে। দেবতারা পূর্ব্ব-কালে পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যের আরাধ্য ছিলেন। ডেউস অথবা ডেভিল বলিয়া আধুনিক দেববিদ্বেষী ধর্ম্মসম্প্রদায় যতই কেন বিদ্বেষ প্রকাশ করুন না, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের অস্তিত্ব বিশ্বাসে যে কোন সন্দেহ ছিল না, তাহা তাঁহাদের বিদ্বেষ প্রকাশেই প্রমাণিত হয়। যে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহাকেই লোকে বিদ্বেষ অথবা ভক্তি করিয়া থাকে; যাহার অস্তিত্ব লোকে অবগত নহে, তাহাকে কখনও বিদ্বেষ করা ঘটে না। অতএব আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। যে কালে জুপিটার, (বৃহস্পতিগ্রহ) বীনস (উশনস্) অগ্নি বরুণ প্রভৃতির পূজা নব্য একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল, তৎকালে ডেউস (দেবঃ) শব্দ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিদ্বেষ ব্যাপক ছিল না। অতএব পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপবাসী একেশ্বরবাদীদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেবোপাসক ও দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও দেবপূজার বহুল প্রমাণ রহিয়াছে; এই জন্যই আমরা বলিতেছি—পৃথিবীর সমস্ত লোক পূর্ব্ব কালে দেবোপাসনা করিতেন।

শাস্ত্রসমূহে দেখিবেন, পূর্ব্বকালে আস্তিক, নাস্তিক সকলেই দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। যে সকল পরম জ্ঞানী যোগীপুরুষ মুক্তির জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দেবোপাসনার অনাবশ্যকতা যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু দেবতা নাই, একথা তাঁহারা কখনও বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, দেবতার উপাসনা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ, আরোগ্য লাভ, বলবীর্য্য লাভ এবং পরকালে স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু মুক্তির নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ; কেননা ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত পদার্থেরই ক্ষয় আছে;—বাঞ্ছিত পদার্থ ক্ষয় হইলে তৎসঙ্গে দুঃখ অনিবার্য্য; অতএব এমন দুঃখজনক ঐশ্বর্য্যাদি লাভ নিমিত্ত যত্ন করা বোকামি; দুঃখ একেবারে না হয়, তাহার চেষ্টা করাই পুরুষার্থ। মুক্তিলাভ হইলে পার্থিব সুখ এবং দুঃখ কিছুই থাকে না; এই মুক্তিই লোকের প্রার্থনীয়। যোগীগণ ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্বাদি সমস্ত পদকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন। কেননা তাঁহারা দূরদর্শিতা বলে দেখিয়াছেন যে, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্বাদি কোন পদই চিরস্থায়ী নহে। এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর, কলি সম্বলিত ৭১ মহাযুগ অতিবাহিত হইলে যখন মন্বন্তর হইবে, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকেও চূর্ণবিচূর্ণ হইতে হইবে; যখন চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাত্মক এক একটি দিনের গণনায় ব্রহ্মার এক শতবর্ষ আয়ু পূর্ণ হইবে, তখন এই জগতের সমস্ত পদার্থ সম্বলিত ব্রহ্মাকেও চূর্ণবিচূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া বিলীন হইতে হইবে; অতএব একদিন না একদিন যখন দেহীমাত্রেরই কষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তখন সে অনিত্যদেহ যাহাতে পুনরায় না ধরিতে হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসে যোগী

গণ দেবত্ব ব্রহ্মত্বাদি তুচ্ছ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের তুচ্ছীকরণে দেবতার দেবত্ব বা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। বরং এই তুচ্ছীকরণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা দেবতার অস্তিত্ব এবং কার্য্য কর্তৃত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। যাহারা মনে করে দেবতা কল্পিত পদার্থ, তাহাদের বুঝা উচিত যে তুচ্ছ করিবার জন্য কেহ কোন পদার্থের কল্পনা করে না। কেহ কি বলে যে, ঐ পদার্থটি ঘোড়ার ডিম অপেক্ষাও মন্দ ? তাহা বলিলে লোকে বুঝিবে কেন ? বস্তুতঃ যোগীগণ—"কষ্ট করিয়া দেবতা হইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু দেবতার সুখও চিরস্থায়ী নহে ;"—ইহা বলাতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, দেবতা আছেন, এবং তাঁহাদের সুখ এবং ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে সুখ চিরস্থায়ী নহে বলিয়া, মুমুক্ষু লোকেরা দেবতা হইয়া সুখ ভোগ করিতে চাহেন না।

পূর্ব্বকালে নাস্তিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায় জন্মিয়াছিল, তাহারা দেবোপাসনার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিত। "যজ্ঞ করিলে দেবতারা কোন্ ফল দিতে পারেন না," ইহা তাহাদের কথা ; কিন্তু "দেবতা নাই" একথা কখনও তাহারা বলে নাই। বরং দেবগুরু বৃহস্পতি —যিনি গ্রহরূপে বিরাজমান, তাঁহাকেই তাহাদের মতের উপদেষ্টা বলিয়া ঘোষণা করিত। যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নাই,—অপ্রত্যক্ষ পরলোকে অবিশ্বাস করিয়াছে, যজ্ঞফল ও শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের নিকটে নভোমণ্ডলের তেজস্পুঞ্জ স্বরূপ বৃহস্পতির উপদেশ প্রদান ক্ষমতা

প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকিলে তাহা কখনও স্বীকৃত হইত না। বস্তুত তৎকালে দেবগণের উপদেশ প্রদানাদি ক্ষমতা সর্ব্ব লোকের প্রত্যক্ষ ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত বলিয়া ঘোর নাস্তিকেরাও তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে ও অন্যকে বিশ্বাস করাইতে সাহসী হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অকুণ্ঠিত চিত্তে দেবতার উক্তি ও কার্য্য সমূহ ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। অসম্ভব কথা কখন এরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত ও অপ্রতিবাদিত রূপে গৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ পূর্ব্ব কালে দেবতাদিগের বাক্‌শক্ত্যাদি এরূপ ভাবে সর্ব্বজন বিদিত ছিল যে, তাহা প্রত্যেক সম্প্রদায় নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ন্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। এবং কলিদ্বারা লোক সমূহ মোহাচ্ছন্ন হইয়া যে ঐ দেবতত্ত্বাদি বুঝিতে অক্ষম হইবে ও দেবতায় জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবে, তাহাও প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লেখ হইয়াছে। যে কলিদ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই কলিদ্বারা আধুনিক লোক সমূহ মোহাচ্ছন্ন; কাজেই দেবতাগণের কার্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ হইতেছে না; কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইলেও দেবতার ক্ষমতা বুদ্ধিমানের নিকটে অসিদ্ধ নহে। যে সকল অহম্মুখ আত্মাভিমানী ব্যক্তি জগতের কার্য্য কারণ সমূহ নির্দ্ধারণে অসমর্থ, তাহারাই দেবক্ষমতায় অবিশ্বাসী, কিন্তু যে সকল প্রজ্ঞা চক্ষু ঋষি পরমর্ষি দ্বারা আর্য্যজাতি অনুশাসিত, তাঁহারা দেবপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিতেন; তাঁহারা নিজে বনজাত ফল মূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়াও দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান

করিয়া ভিক্ষা লব্ধ ঘৃতাদি উপাদেয় পদার্থ সমূহ উৎসর্গ করিতেন; দেবতার অনুগ্রহে সকল প্রকার কাম্য পদার্থ লাভ করিতেন। আজ সেই ঋষি পরমর্ষিগণের বংশধরগণ একবার আত্মাভিমান ছাড়িয়া অনুসন্ধান করুন, দেবতার অসাধারণ ক্ষমতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অমনি মস্তক অবনত করিবেন।

এখন দেখা কর্ত্তব্য, মুমুক্ষু যোগীগণ যে কারণে দেবোপাসনাকে তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন, সেই কারণ বিষয়-সুখাভিলাষীদিগের পক্ষেও প্রযুজ্য কিনা? দেবোপাসনায় যে, জীবনের উন্নতি হয়, নানাবিধ সুখ সৌভাগ্য লব্ধ হয়, তাহা মুমুক্ষু যোগীগণও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বেদ, পুরাণ, কাব্য, এমন কি—চিকিৎসা শাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রাচীন যে কোন গ্রন্থে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, দেবোদ্দেশে যজ্ঞ বা উপাসনা করিয়া বহুলোক স্বর্গলাভ করিয়াছেন, বহুলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য—সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন; বহুলোকে অসাধারণ শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বিক্রম প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়াছেন; স্ত্রী, পুত্র, আরোগ্য প্রভৃতি যে উদ্দেশে যিনি যথাবিধানে দেবোপাসনা করিয়াছেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যযাতি হরিশ্চন্দ্রাদি বহু ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিয়াছেন; দেবদ্রোহী রাক্ষস ইন্দ্রজিৎও যজ্ঞীয় মন্ত্রপ্রভাবে অগ্নিদেবতা হইতে ব্যোমযানাদি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোক পরাজয়ে সমর্থ হইতেন, দেবাকর্ষক মন্ত্রবলে কুন্তী ভীমার্জ্জুনাদিরূপ পুত্রগণকে লাভ করিয়াছিলেন; এই কলিকালে নাস্তিক দ্বারা বিদ্রূত প্রাণী বৃন্দের সমক্ষে যে ঐতিহাসিক অগ্নি বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল,—যে চারিটি মাত্র

বীরের প্রবল পরাক্রমে নাস্তিক বাদের পরিপোষক নৃপতিকুল পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল; তাঁহারাও যজ্ঞাগ্নি হইতে সমুদ্ভুত। এইরূপ দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞাদির অসাধারণ ফল পুরাতন গ্রন্থ সমূহের যে কোন পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়। যে দেবোপাসনায় এমন লাভ, মুমুক্ষু যোগীদিগের মুক্তিবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক কথাক্রমে তাহাতে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য কিনা, এখন তাহাই বিবেচ্য। যিনি ব্রহ্মার পদ— অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বহুকল্পব্যাপী আধিপত্য করাও তুচ্ছ মনে করেন, তেমন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে ঐ কথা শোভা পায়; কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা সামান্য কয়েকটি টাকা বেতনের জন্য পরের গোলামী করিতেছে, চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোন উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে যাহারা শ্লাঘ্য মনে করিতেছে, বল লাভের জন্য যাহারা সাপ ব্যাঙ পর্য্যন্ত আহার করিতে ধরিয়াছে, আরোগ্য লাভের জন্য যাহারা পেটের মধ্যে ঔষধের ডিস্পেন্সরি সাজাইয়াছে, যাহারা সামান্য রমণীর জন্য আত্মবলিদান দিতে কুণ্ঠিত নহে, যাহারা এক হাত ভূমি দখল নিমিত্ত শত শত ব্যক্তির হত্যা সাধনে কুণ্ঠিত নহে, সেই সকল বিষয় বিমুগ্ধ ব্যক্তির নিকটে কি ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, স্বর্গ, সম্পদ, সাম্রাজ্য, আয়ু ও বলবিক্রমাদি প্রার্থনীয় নহে? এই সমস্ত লাভের জন্য দেবোপাসনা করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নহে কি? বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মুমুক্ষুর উপদেশ গ্রহণ করা নেহাত বোকামি নহে কি? মুক্তি গাছের গোটা নহে; বিষয় বাসনা ও সুখ দুঃখ অনুভূতি পরিত্যাগ না করিলে

শত্রু মিত্র, ভাল মন্দ, লাভালাভ, আত্মপর বিভেদ জ্ঞান দূর না হইলে কখনও মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। মোক্ষ বিষয়টি ধর্ম্মের ঠিক বিপরীত। মোক্ষমার্গ অবলম্বন দ্বারা শরীরকে দিন দিন ক্ষয় করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মে লীন হইতে হয়, কিন্তু ধর্ম্মমার্গ অবলম্বন করাতে দেহ মন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কার্য্যক্ষম হয়। দেবোপাসনা এই ধর্ম্মেরই লক্ষ্য। অতএব ইহপরকালে যাহার সুখ লাভের বাসনা আছে, তাহার দেবোপাসনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

যে দেবতাগণের এমন প্রভাব, যাঁহারা সেই পরম প্রজ্ঞাবান্ ঋষি পরমর্ষিগণ দ্বারা উপাসিত হইতেন, তাঁহারা কে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। সৃষ্টি রহস্যে প্রদর্শন করিয়াছি, এক একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই। জগতে যত প্রকার পদার্থ পরিলক্ষিত হয়, তিনি একাকীই তৎসমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহার বিভিন্নরূপ শক্তি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পদার্থ গঠিত হইয়াছে। যেমন একই মাটি কতক ঘটরূপে, কতক কলশরূপে, কতক হাঁড়ীরূপে, কতক পুতুলরূপে ও কতক প্রতিমা প্রভৃতি নানারূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন কাজে লাগিতেছে, তেমনই এক সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম বিভিন্নরূপে বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি একাই জলরূপে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছেন, আবার অগ্নিরূপে জল শোষণ করিতেছেন, একাই তিনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বশক্তি বিকাশ করিতেছেন। এই সমস্ত পদার্থ ছাড়া তিনি জগতের বাহিরে কি ভাবে

আছেন, জানিনা. কিন্তু জগতে যাহা কিছু দেখি. শুনি, বা অনুভব করি, সমস্তই তিনি। আমাদিগের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সমস্ত গুলিতেই বহুপ্রকার শক্তির মিশ্রণ অনুভূত হয়। এই মিশ্র পদার্থ গুলিকে বিভক্ত করিতে পারিলে পঞ্চবিংশতি জাতীয় খাটি পদার্থ অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা সৃষ্টি রহস্য বিষয়ক প্রবন্ধে ঐ গুলির নাম ও বিকাশের পৌর্ব্বাপর্য্য উল্লেখ করিয়াছি ; পাঠক স্মরণ করিয়া দেখিবেন, তৎসঙ্গে কতিপয় দেবতার নামও উল্লেখ হইয়াছে. আগামীতে আমরা আরও কয়েকটী দেবতার নামসহ তাঁহাদের স্বরূপ ও কার্য্য ক্ষমতাদি উল্লেখ করিব।

দেবতা-রহস্য। (২)

যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই ; যখন একাই তিনি বহুরূপীর সাজ ধরিয়া বহুরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিকাশ পাইতেছেন, তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক, আর অনুমান বলে হউক, যে কোনরূপে যাহা অবগত হইব, তাহাকেই তাঁহার এক একটি বিকাশ বলিয়া মানিতে হইবে। তিনি ত সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু যাহাতে তাঁহার শক্তির বিকাশ নাই. তাহার পূজা হয় না ; যাহাতে শক্তি বিশেষ রূপে প্রকটিতা হন, তাহারই পূজা করিতে হয়। যেমন সাধারণ লোকসমূহ মধ্যে যাহার ক্ষমতা বেশী, তাঁহার নিকট অবনত হইতে হয় ; যিনি বিশেষ কোন গুণে গুণী, তাঁহারই পূজা করা লোকের স্বাভাবিক কার্য্য, তদ্রূপ সেই রূপগুণ নামাদি বর্জ্জিত পরব্রহ্মের

যে যে রূপে শক্তির বিশেষ বিকাশ পায়, তাহাই পরম পূজনীয়। ঐ সমস্ত বিশেষ গুণের পূজাই তাঁহার পূজা, তৎভিন্ন তাঁহার পৃথক পূজা হওয়া অসম্ভব।

আমরা সৃষ্টি-রহস্য বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছি; পরব্রহ্মে প্রকৃতির আবির্ভাব হওয়াতেই সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; সেই প্রকৃতিকেই সর্ব্বপ্রধানা ও সর্ব্বজননী বলিয়া পূজা করা বিহিত হইতেছে। তাঁহা হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়; এই চৈতন্য—মহৎ ঈশ্বর প্রভৃতি নামের বাচ্য। জগতে এই চৈতন্যের পূজা অতর্কিতভাবে হইয়া থাকে। চৈতন্যের পরে অহঙ্কারের উৎপত্তি; অহঙ্কার শিব এবং অনন্ত (নাগ) রূপে পূজনীয়। যে কারণে পুত্র পিতার আকৃতি প্রকৃতি অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পরে সৃষ্ট পদার্থগণ পূর্ব্বসৃষ্ট পদার্থের গুণ কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হয়। এই কারণে অহঙ্কারে কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরত্ব, প্রকৃতি, ও পরমাত্মা থাকা সত্ত্বেও অহংকারিতা তাঁহার বিশেষ গুণ। অহঙ্কারের পরে মন, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক, হস্ত, পদ পায়ু উপস্থ, মুখ,—এই সকল ইন্দ্রিয় শক্তির উপাদান ও ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল ও অগ্নি—এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট পদার্থগণের বিকাশ হয়; অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম নিজেই নিজের নুতন নুতন শক্তির বিকাশ জন্য ঐ সমস্ত পদার্থে পরিণত হন। ঐ সকল পদার্থ জগতের মূল উপাদান। ঐ সকল পদার্থের মিশ্রণে প্রথমতঃ আরও যে কতকগুলি পদার্থ গঠিত হয়, তাহারাও মূল উপাদানের ন্যায় এক একটি বিশেষ গুণ বিকাশ করিতেছে। এই সকল পদার্থের

মধ্যে মনু ধাতা, বিধাতা; প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

জগতে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল প্রকার পদার্থই মিশ্র। এই মিশ্র পদার্থগণ মধ্যে যেটিতে যে জাতীয় পদার্থের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়, তাহা সেই পদার্থের নামে পরিচিত হয়। আমরা যাহাকে জল বলিয়া জানি, তাহাতে উল্লিখিত পদার্থগণের প্রায় সকলই আছে, কিন্তু তাহাতে জলীয় পরমাণুর ভাগ অধিক বলিয়া জলের গুণ অধিকতররূপে প্রকাশ পায়, এজন্য আমরা তাহাকে জল বলি। জলের ন্যায় বায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল পদার্থ মিশ্র। মিশ্র পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের গুণও মিশ্রভাবে প্রকাশ পায় ও কতকগুলি পদার্থের গুণ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন—হরিদ্রার সঙ্গে চাখড়ী মিশাইলে হরিদ্রার পীতবর্ণ ও চাখড়ীর শ্বেতবর্ণ মিশিয়া যেন একটা মাঝামাঝি গোছের রং প্রকাশ পায়; তাহাতে পীতত্বও অনুভূত হয়, শ্বেতত্বও অনুভূত হয়; সুতরাং তাহাতে পূর্ব্ব পদার্থের গুণই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ঐ হরিদ্রাতে শ্বেতবর্ণ চুণ মিশাইলে পীতত্বও থাকে না, শ্বেতত্ত্বও থাকে না; ঐ উভয় পদার্থের অতিরিক্ত একটা গভীর লালরঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্ব স্বষ্ট পদার্থগণ মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মশক্তির বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, তাহা মিশ্র হইলেও বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্বত্র বিশেষ গুণেরই পূজা হয়। গুণ যেখানে বিশেষরূপে বিকাশ না হয়, তাহার

গুণ যথেষ্ট থাকিলেও তাহার পূজা হয় না। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া পাঠক সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন, প্রত্যেক বিষয়ে উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বত্রই বিশেষ গুণের পূজা হয়, ব্যক্তির পূজা হয় না। যিনি একদিন অসাধারণ ক্ষমতাবলে সকলের পূজনীয় হন, ক্ষমতা চ্যুত হইলে তাঁহাকেই আবার লোকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। একটি বীরপুরুষ সহস্র দুর্ব্বলের নিকটে পূজা পাইতে পারে, কিন্তু সহস্র বীরপুরুষ একত্র হইলে কাহারও ভাগ্যে পূজা পাওয়া ঘটে না। বীরত্ব গুণ তখন বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না বলিয়া বীরের যে ক্ষমতা, তাহাও ঝাপ্য থাকে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই এইরূপ বিশেষ গুণের পূজা হয়। এবিষয়ে ভগবান্ নিজে গীতাতে যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ দিলেই পাঠক বুঝিবেন, তিনি সেই বিশেষ গুণকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরোক্ত কথা গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই দেবত্ব বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। যাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় দেবতার অর্থ তাহাই। সেই পরব্রহ্মের দাহিকা শক্তি তাঁহার অগ্নি নামক অংশের বিশেষ গুণ, এজন্য অগ্নিকে "দেব" এবং দাহিকা শক্তিকে দেবতা বলা যায়; এইরূপ বায়ুকে দেব ও বায়ুর বিশেষ শক্তি স্পর্শকে দেবতা বলা হয়। জলের অন্যতম বিশেষ শক্তি "আবরণী" দেবতা, তাঁহার অবলম্ব ব্রহ্ম বরুণদেব নামে আখ্যাত। এইরূপ একই ব্রহ্ম যে বিশেষ বিশেষ শক্তির অবলম্বনরূপে যে বিশেষ বিশেষ পদার্থে পরিণত হইয়াছেন, সেই শক্তিগুলিকে দেবতা ও সেই

শক্তিমান্ পদার্থগুলিকে "দেব" বলা হয়। বিশেষ বিশেষ গুণ প্রকাশক পদার্থ মাত্রকেই "দেব" বলা যাইতে পারে. কিন্তু সেই বিশেষ গুণ লোক সমূহের উপকার জনক না হইলে সেই বিশেষ গুণশালীকে দেব বলিবার পদ্ধতি নাই। যাঁহা দের বিশেষ গুণ সর্ব্বসাধারণের উপকারার্হ প্রযুক্ত হয়. তাঁহারাই "দেব" নামে পরিচিত হন।

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র সকলের প্রধান; তিনি বিদ্যুৎনামক দেবতার অধিষ্ঠান। ইন্দ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম "অণু"। যে জাতীয় অণু মনুষ্যাদির অবয়বে থাকাতে হস্তের আকার গঠিত ও হস্তের কার্য্যক্ষমতা জন্মে, এবং যাহার প্রভাবে লোকের আধিপত্য জন্মে, তাহা ইন্দ্র নামে অভিহিত। ইন্দ্র সূক্ষ্ম অণুরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও স্বর্গলোকে একটি প্রকাণ্ড অবয়বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্রের বিদ্যুৎশক্তি প্রভাবে মেঘ বৃষ্টি হইয়া থাকে। মেঘের উপরে ইন্দ্রের আধিপত্য যে অধিক, তাহা কেবল মেঘ লোকে নিয়ত বিদ্যুৎ স্ফুরণেই প্রমাণীকৃত হয়। ঐ জন্য, ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা হইয়াও বিশেষরূপে মেঘের রাজা। ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজা —সকল দেবতার প্রধান বলা হয় কেন, তাহা পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ বিশেষ অবগত থাকিলেও আধুনিক লোকের বুঝিবার পক্ষে বড় কঠিন হইয়াছিল. কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিদ্যুৎশক্তির প্রভাব দেখিয়া বিজ্ঞজনের পক্ষে তাহা বুঝা বড় সহজ হইয়াছে। নব্যবিজ্ঞানের বিদ্যুৎ নব্যবিজ্ঞাত সমস্ত পদার্থের উপরে আধিপত্য করিতেছে। বিদ্যুৎ একাকীই সকল দেবতার ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত কার্য্য

সমাধা করিতেছে। বিদ্যুতের এই কার্য্য ক্ষমতা দ্বারা যেন বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রের অসাধারণ, অসহজ দ্রষ্টব্য অতুল মহিমা ঘোষণাকারী সেই সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারদিগের কথাগুলি বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, নব্যবিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে যাহাকে পজিটিভ পাওয়ার বলা হয় তাহাই ইন্দ্র, এবং যাহাকে নিগেটিভ পাওয়ার বলা হয়, তাহা দধিচিমুনির মৃত উপাদান। আমরা এপ্রস্তাবে আর সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। ইন্দ্রের স্বরূপ ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধেও এবার অধিক কিছু বলা গেল না। যাহা উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিবেন, যে ইন্দ্র অথবা তদীয় বিদ্যুৎশক্তি নামক দেবতার এমন অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁহাকে ঈশ্বর শক্তিরূপে পূজা করিতে কোন আপত্তির কারণ আছে কি না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকল লোকে ক্ষমতারই পূজা করিয়া থাকে; ঈশ্বরের যদি ক্ষমতা স্বীকৃত হয়, তবে বিদ্যুতের মহতী ক্ষমতাই তদীয় ক্ষমতার প্রধান নিদর্শন বলিয়া স্বীকার্য্য। যদি কাহারও ক্ষমতাবান্ ঈশ্বরকে পূজা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যুৎশক্তির অবলম্ব ইন্দ্র-দেবকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা সঙ্গত হইবে। পূজা করার আবশ্যকতা ও উপকারিতা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

দেবতা-রহস্য। (৩)

এখন কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা অনেকে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ধাতা, মিত্র, অর্য্যামা, শক্র, প্রচেতা, অংশ, ভগ, বিবস্বান, সবিতা, পুষা, বিশ্বকর্ম্মা,—আদিত্যগণ; ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাত,—বসুগণ; মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভগ,—রুদ্রগণ; প্রজাপতি ও বষটকার,—এই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে এখন আর লোকসমূহকে আরাধনা করিতে পরিলক্ষিত হয় না। মূল দেবতা তেত্রিশটা, তাঁহাদের মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু এখনও আরাধিত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু অপর বত্রিশটী মূল দেবতার পূজা যেন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালে পরম প্রজ্ঞাবান্ পরমর্ষিগণ যাঁহাদের পূজা করিয়া সুখী হইতেন, আজ কলি সুলভ মোহাচ্ছন্ন লোক সমাজে কেন তাঁহাদের পূজা রহিত হইল? সমস্ত বেদ যাঁহাদের পূজার মন্ত্র সমূহে পূর্ণ, তাঁহাদের পূজায় আজ বেদ পরায়ণ হিন্দুবর্গের মনোযোগ নাই কেন? কেনা জানে যে, ঋষিগণ হোমযজ্ঞে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন; তাঁহারা বনবাসী হইয়াও বহুকষ্টে যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিতেন, যজ্ঞের বহু ফল লাভাশায় চুরি পর্য্যন্ত করিয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছিল; কেনা জানে, দেবতাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদানই যজ্ঞের প্রধান কার্য্য; দেবতাদিগকে আহুতি

প্রদান ভিন্ন কোন হোম যজ্ঞ সম্পাদিত হয় না। যে দেবতা সমূহ এইরূপ সমস্ত ঋষিবর্গের আরাধ্য, যে দেবতা সমূহকে আহুতি দেওয়া সমস্ত হোম যজ্ঞের লক্ষ্য; যে দেবতা সমূহ সর্ব্বশাস্ত্রে সংকীর্ত্তিত, সেই দেবতাদিগের প্রতি আজ লোকের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় না কেন? সেই দেবতা সমূহের স্বরূপ বুঝিতে আজ সমস্ত লোক উদাসীন কেন? সেই দেবতা-দিগকে আজ লোকে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে কেন?

স্বয়ং ভগবান্ গীতার ৩য় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ ॥ ১৩

"যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর, দেবগণও তোমা-দিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন; পরস্পর পরস্পরের সংবর্দ্ধন করিয়া উভয়েই পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ সমূহ প্রদান করিবেন; যাহারা সেই দেবদত্ত ভোগসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া জান। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন, আর যাহারা নিজের জন্য পাক করে, তাহারা পাপই ভোজন করিয়া থাকে।"

যিনি অর্জ্জুনের সর্ব্বপ্রকার মোহ নিবারণ জন্য গম্ভীর

বিজ্ঞান সম্বলিত অমূল্য উপদেশ সমূহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই বহু সম্মানিত উপদেশে যে দেবোদিষ্ট দানের এমন প্রয়োজনীয়তা প্রকটিত হইতেছে, তৎপ্রতি কাহার অশ্রদ্ধা করা উচিত? ভগবান্ নিজের পূজায় অধিকতর রূপে লোকের মন আকর্ষণ ও ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ লাভে লোককে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত দেবোপাসনার একটু হীনতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপিমামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং
অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ।
নতুমামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃ ব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাযান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাং।

"হে কৌন্তেয়, যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষপ্রদ বিধি-সম্মত নহে। আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; যাহারা এইরূপ আমাকে জানে না, তাহারা দেবোপাসনা প্রভাবে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও তথা হইতে চ্যুত হয়।" (অর্থাৎ তাহাদের স্বর্গ চিরস্থায়ী হয় না।) যাহারা দেবতার যাজক তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়, যাহারা পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করে, তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, যাহারা ভূতের পূজা করে, তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহারা আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।"

ভগবানের এই উক্তি হইতে অনেকে বুঝিতে পারেন যে,

ভগবান্ দেবোপাসনাদির নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি মোক্ষলাভের অধিকারী, কোন বিষয় বাসনা যাঁহার নাই, তাঁহার পক্ষে ভগবানের আরাধনাই যে অতি উত্তম পরামর্শ তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাহারা সেই অতি উত্তম মোক্ষলাভের অধিকারী নহে, যাহারা বিষয় সুখ—ধন, জন, বল, বিক্রম, সুখাদ্যাদি ভোগ বিলাসের উপকরণ সমস্ত ও যশপ্রভৃতির প্রার্থী তাহাদের পক্ষে দেবোপাসনাই অতীব প্রয়োজনীয়। ভগবান্ দেবোপাসনার নিন্দা করিয়াও বলিতেছেন, "দেবোপাসনা দ্বারা দেবত্ব লাভ হয়।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "দেবতার অনুগ্রহেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু লাভ হইয়া থাকে।" ইহাতেও কি ভোগার্থীর পক্ষে দেবোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদের ঈশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণকে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষ মনে করে। তাঁহার উক্তি অথবা ভগবৎগীতার ন্যায় একখানি জগতের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র যিনিই প্রণয়ন করিয়া থাকুন, তাঁহারই উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেও গীতার শ্লোকগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ; তিনি দার্শনিক চূড়ামণি, তিনি বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ, তিনি সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ। তিনি দেবতার খোসামুদে হইলে দেবোপাসনা অপেক্ষা অন্যের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেন না ; দেবোপাসনা প্রচার করা যে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য নহে, তাহা গীতার পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ নিন্দার মুখে যে গুণ প্রকাশ পায়, সে গুণ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ করা উচিত নহে।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তি দ্বারা দেবোপাসনার যে মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অতীব সত্য, অতীব প্রয়োজনীয়। এরূপ প্রয়োজনীয় না হইলেও কি যাঁহারা সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিজন্ বনে ফল পত্রাদি ভক্ষণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেন, তাঁহারাও দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদি করিতেন? যে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করতঃ সর্ব্বপ্রধান পদ ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন; তাঁহারাও দেবতাদিগকে প্রসন্ন করা অতি প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। বেদ পাঠক দেখিবেন; বেদোক্ত অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি অধিকাংশ বিশ্বামিত্র ও তদীয় সন্তানগণ দ্বারা প্রকাশিত। এইরূপ অন্যান্য ঋষিবর্গই দেবোদ্দিষ্ট বেদ মন্ত্র সমূহের প্রকাশক, এবং ঋষি মাত্রই দেবতার যাজক। শাস্ত্রে যত জনের ক্ষমতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেকেই দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছেন; ভগবান্ রামচন্দ্রও যজ্ঞ করেন, রাক্ষস রাবণও যজ্ঞ করিয়াছে; পরম জ্ঞানী জনকও যজ্ঞ করিয়াছেন, অসুর প্রধান বলিও যজ্ঞ করিয়াছেন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যজ্ঞ করিয়াছেন, কৃষ্ণ বিদ্বেষী কংসাসুর ও জরাসন্ধ প্রভৃতিও যজ্ঞ করিয়াছেন; যে যজ্ঞে এমন সর্ব্ববাদী সম্মত নিষ্ঠা ছিল, সেই যজ্ঞের কি বিশেষ ফল না থাকিলে কেহ কখনও তাহা করিত? বলা বাহুল্য এই সর্ব্বজনাদৃত হোম যজ্ঞে দেবতারাই আহুত হইয়া থাকেন; স্বয়ং ভগবানের উদ্দেশে আহুতি দিবার সময়েও "অগ্নয়ে স্বাহা" বলিতে হয়।

কেহ মনে করিতে পারেন, "অসুরগণ দেবতার শত্রু ছিল, —তাহারা কেন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিবেন? এই

কথাটি বুঝিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বে লিখিত সৃষ্টি রহস্যের কথা গুলি স্মরণ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্ম জগতের যে বিভিন্ন জাতীয় উপাদান সমূহে পরিণত বা অভিব্যক্ত হইয়াছেন, সেই উপাদান সমূহের বিভিন্ন গুণ সমূহই বিভিন্ন দেবতা। ঐ উপাদান সমূহের পরস্পর মিশ্রণে জগতের সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ উপাদান সমূহ জগতে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, মাঝে মাঝে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, মানুষ, গোরু প্রভৃতি নানা অবয়বরূপেও পরিলক্ষিত হইতেছে। ঐ অবয়ব সমূহ মধ্যে যেটিতে যে জাতীয় দেবতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ পান, সেই অবয়ব সেই দেবতার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন বিদ্যুৎ দেবতার অবলম্ব ইন্দ্র নামক সূক্ষ্মাণুগণ অধিকতররূপে যে অবয়বে অবস্থান করিতেছেন, সেই অবয়ব "ইন্দ্র" নামে অভিহিত; এইরূপ সবিতা নামক অণুগণের আধিক্যে সূর্য্য, উপেন্দ্র নামক অণুগণের আধিক্যে বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ স্বনামধেয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানে গঠিত। ইন্দ্রাণুগণ জগতে সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের শরীরে যে ইন্দ্রাণু আছে, তদ্দ্বারাই আমাদের হস্তের অবয়ব গঠিত ও হস্তের কার্য্য ক্ষমতা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের শরীরে এবং জগতের অন্য সমস্ত অবয়বে যে ইন্দ্রাণুগণ আছে, তদপেক্ষা ইন্দ্র নামক স্বর্গীয় সর্ব্বপ্রধান পুরুষের অবয়বে সমধিক পরিমাণে আছে; এই জন্য তাঁহার নাম ইন্দ্র দেব। যেমন সুমেরুস্থিত অধিক পরিমিত চুম্বক দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত স্থানে বিস্তৃত চুম্বক সমূহ নিয়মিত হইতেছে; যেখানেই চুম্বক রাখ না কেন, সে সু-

যোগ পাইলেই উত্তর দিকে যাইবার জন্য যেন উদগ্রীব হইয়া থাকে; সেইরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত ইন্দ্রাণুগণও সেই দেবেন্দ্র কর্তৃক নিয়মিত হইতেছে। আমাদের অবয়বে ও জগতে বিস্তৃত ইন্দ্রাণুগণ সহ ইন্দ্রাবয়বের ইন্দ্রাণুগণের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। পরিবর্ত্তনই জগতের কার্য্য।

দেবতা-রহস্য। (৪)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে যে ইন্দ্রদেব ও ইন্দ্রাণুগণের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য দেবগণ জগতে বিস্তৃত স্বস্ব সজাতীয় পদার্থগণের উপরে ঈশ্বরত্ব করিতেছেন। ইন্দ্রাণুগণ যেমন জগতের সকল অবয়ব অপেক্ষা ইন্দ্র দেবের অবয়বে সমধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ উপেন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধাতা, মিত্র, অর্য্যামা প্রভৃতি নামধেয় দেবাণুগণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে যে অবয়বে অবস্থান করিতেছে সেই সেই অবয়ব সেই সেই "দেব" নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। জগৎবিস্তৃত স্ব স্ব নামীয় পদার্থগণের প্রতি সেই সেই দেবগণের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনে করুন, যেমন চুম্বক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে; তন্মধ্যে সুমেরু কেন্দ্রে অধিক পরিমাণে আছে; অন্যত্র কোথাও খণ্ড খণ্ডরূপে কোথাও অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্ররূপে রহিয়াছে? এখন একখানি ক্ষুদ্র চুম্বকের দুইদিকে যদি দুইখানি চুম্বক রাখা যায়, তবে, মধ্যবর্ত্তী চুম্বকখানি তন্মধ্যে বড় চুম্বকখানির দিকে যাইবে; কিন্তু সেই বড় চুম্বকখানি

যদি দূরে থাকে, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চুম্বকখানি এমন নিকটে থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্র চুম্বকের আকর্ষণ বৃহৎখানি অ-পেক্ষা অধিক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রখানির দিকেই যাইবে; এবং দুইখানিই যদি এমন দূরে থাকে যে তাহাদের আকর্ষণ মধ্যবর্ত্তী থানির উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তবে মধ্যবর্ত্তী থানি কোন দিকে না যাইয়া সেই সুমেরু কেন্দ্রের দিকেই আকর্ষিত হইতে থাকিবে, ঐ খণ্ড বা মিশ্র চুম্বকগুলির জন্য আর তাহার উত্তরাভিমুখতা রহিত হইবে না। ঐ সুমেরুর ন্যায়, ইন্দ্র, উপেন্দ্রাদি দেবগণের ক্ষমতা জগৎবাসীর উপরে প্রযুক্ত হইতেছে। যদিও অন্যান্য অব-য়বে ইন্দ্রাণু উপেন্দ্রাণু প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহা যেন ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ড খণ্ড চুম্বকের ন্যায়; তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রগুলির উপরে আধিপত্য করিতে পারে বটে, কিন্তু সে আধিপত্য অতি অল্প দূর ব্যাপী; যতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হওয়া নিয়মিত আছে, তাহার অধিক দূরে তাহাদের ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যেই মাত্র নিকটবর্ত্তী অন্য স্বজাতীয় পদার্থের আধিপত্য রহিত হয়, তখনই সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ দেবের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়।

পরস্পর আদান প্রদান পরিবর্ত্তন পদার্থ মাত্রের একটি নিত্যধর্ম্ম। জগতের সমস্ত পদার্থ নিত্য গতিশীল, কেহ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এই জন্য "নিত্য গতিশীল"—অর্থে "জগৎ" নাম হইয়াছে। যেমন প্রদীপ একদিকে অদৃশ্যভাবে তৈল টানিয়া আগন্তুক তৈলকে আপনার স্বরূপ করিয়া আ-পনি অদৃশ্য বাষ্পাকারে চলিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ অল্পকাল

মাত্র পূর্ব্বে যে পদার্থ প্রদীপরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, এখন আর সেই পদার্থই প্রদীপরূপে নাই,—নূতন তৈল আসিয়া প্রদীপ হইতেছে, পুরাতন প্রদীপ বাষ্পরূপে চলিয়া গিয়াছে; তদ্রূপ জগতের প্রত্যেকটি পদার্থের নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা খাদ্য সামগ্রী এবং প্রশ্বাস বায়ু ও বায়ুর সঙ্গে যে সকল পদার্থ অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে, তাহা আনিয়া (তৈলবৎ) আমাদের শরীরে (প্রদীপে) পরিণত করিতেছি; আর যে সকল পদার্থ পূর্ব্বে আমাদের শরীর রূপে পরিচিত ছিল, তাহারা নাসিকা দ্বারা, লোমকূপ দ্বারা এবং পায়ু ও উপস্থাদি দ্বারা চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে আমাদের দেহের উপাদান সমূহ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পদার্থ সমূহের পরিবর্ত্তন কাহার সঙ্গে হয়? এপরিবর্ত্তন শুধু ইতস্ততঃ নিকটবর্ত্তী বাহ্যপ্রদেশের সঙ্গে নহে, উহা বাহ্যপ্রদেশের সঙ্গে হইলেও পরিবর্ত্তনের প্রধান স্থান সেই দেবগণ। যেমন আমাদের চক্ষুর আলোক প্রথমতঃ বাহ্যপ্রদেশে যাইতেছে, কিন্তু তথা হইতে সেই জগৎ চক্ষু সূর্য্যে যাইয়া প্রবেশ করিতেছে, এবং সূর্য্যের আলোক বাহ্যপ্রদেশে আসিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ঐইরূপ আদান প্রদানেই আমরা সূর্য্যকে ও বাহ্যপ্রদেশকে দেখিতেছি, এ আদান প্রদান না থাকিলে কোন ক্রমেই আমরা কিছু দেখিতে পাইতাম না; তদ্রূপ অন্যান্য শারীর পদার্থেরও পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা চলিতেছে। অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদেব,—এই তিনের সংযোগ—পরস্পর আদান প্রদান না হইলে কোন পদার্থের উপলব্ধি হয়না।

দেবগণের সহিত অন্যান্য অবয়বের ঐরূপ যে আদান

প্রদান নিয়মিত রূপে চলিতেছে, যাহা দ্বারা সেই নিয়মের ব্যাঘাত জন্মে,—সুতরাং জগতের কার্য্য রুদ্ধ হয়—তাহাকেই অসুর বলা যায়। মনে করুন, যেমন সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর যে আদান প্রদান চলিতেছে, তদ্দ্বারা পৃথিবী বহুপ্রকারে উপকৃত হইতেছে; একখণ্ড স্থায়ী মেঘ আসিয়া পৃথিবীর সকল দিক্ এমনভাবে আবৃত করিতে পারে, যাহাতে সূর্য্যের কার্য্য পৃথিবীতে রহিত হয়। সূর্য্যোত্তাপ ব্যতিরেকে ২। ৩ দিনেই শস্যাদির মহান্ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়; যদি সুদীর্ঘকাল ঐরূপ থাকে, তবে লোকসমূহকে ভয়ানক কষ্টে পতিত হইতে হয়। অতি পূর্ব্বকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন মেঘের উৎপত্তি হইয়া ঐরূপে পৃথিবীকে আবৃত করিয়াছিল, কিন্তু তখনও মেঘে বিদ্যুৎশক্তি সংক্রামিত হয় নাই; মেঘ এই সুযোগে সুদীর্ঘকাল পৃথিবীকে আবরণ করিয়া থাকিল; এই অবস্থাপন্ন মেঘের নাম "বৃত্র" অসুর; সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল; লোকপাল দেবগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন; তখন মৃত দধিচির উপাদান নিজ শক্তিতে যোগ করতঃ ইন্দ্রদেব বজ্রের নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রের উপরে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; তাহার আঘাতে বৃত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিলেন। এইরূপে অন্যান্য অসুর উৎপন্ন ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া জগতের নিয়মিত কার্য্যে যে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, এবং দেবগণ লোক হিতার্থে ঐ অসুরগণকে নিহত করিয়া জগতে কিরূপে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

দেবতা-রহস্য। (৫)

কলিপ্রভাবে লোকসমূহ দেবতত্ব বুঝিতে নিতান্ত অমনোযোগী হইলেও যে সকল আর্য্যসন্তান আপনাদিগকে প্রাচীন মহর্ষিগণের বংশধর বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণের আরাধ্য সর্ব্বশাস্ত্রে সংকীর্ত্তিত দেবরহস্য জানিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ দেবতত্ব না বুঝিলে দেব পূজায় আপনার মনপ্রাণ উৎসর্গ না করিলে পরকালে কোনরূপেই মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। আমাদের সুখ সৌভাগ্য চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই পূর্ব্ব জন্মকৃত দেবোপাসনার ফল। পূর্ব্ব জন্মে সূর্য্যোপাসনা না করিলে আমরা চক্ষু প্রাপ্ত হইতাম না; এমন কিছু হইতাম, যাহার চক্ষু নাই; অথবা অন্যান্য দেবোপাসনা দ্বারা মানব শরীর লাভ করিলেও সূর্য্যোপাসনা অভাবে অন্ধ হইয়া জন্মিতাম। চক্ষু হওয়া না হওয়া, থাকা না থাকা, আমাদের নিজ ক্ষমতার অধীন নহে। ইহা আমরা কেবল সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এইরূপ, ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে হস্ত এবং আধিপত্য, বিষ্ণুদেবের অনুগ্রহে পদ এবং পদস্থতা, অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অনুগ্রহে কর্ণ এবং শ্রবণ শক্তি বরুণ দেবের অনুগ্রহে জিহ্বা, ভূদেবতার অনুগ্রহে নাসিকা, বায়ুর অনুগ্রহে চর্ম্ম, প্রজাপতির অনুগ্রহে উপস্থ পুষার অনুগ্রহে পায়ু চন্দ্রের অনুগ্রহে মন, বৃহস্পতির অনুগ্রহে বুদ্ধি, এইরূপ অন্যান্য দেবতার অনুগ্রহে অন্যান্য কার্য্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ধাতা আমাদের শরীরের উপাদান সমূহকে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতেছেন, মিত্র আমাদের মেদ রূপে শরীরস্থ যন্ত্রাদির স্থিতি স্থাপকতাদি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন, অর্য্যামা ভুক্তদ্রব্যাদির যে ধাতীয় উপাদান শরীরের যে অংশে প্রযোজ্য, তাহাকে সেই স্থানে চালনা করিতেছেন ; অংশদেব শরীরের শিরা ও ধমনী রূপে রক্তাদি চলাচলের পথ প্রদান করিতেছেন ; ভগদেব স্ত্রী পুরুষাদি যেরূপে যাহার বিকাশ পাওয়া আবশ্যক, সেইরূপে তাহাকে পরিণত করিতেছেন ; ত্বষ্টৃদেব যাহার পক্ষে যে অঙ্গের যে প্রকার গঠন হওয়া আবশ্যক, তাহার সেইরূপ অঙ্গ গঠন করিতেছেন। দেবগণ যদি এইরূপে আমাদের শরীরাদি গঠনে নিযুক্ত না হইতেন, তবে নব্যবিজ্ঞানের জড়পদার্থগণ দ্বারা এমন সুপ্রণালীতে শরীরের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইত। নব্যবিজ্ঞানোক্ত যে সকল উপাদানে শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহা একত্র মিশ্রিত করিয়া যখন কোন প্রাণীর দেহ গঠন ও তাহাতে জীবনের কার্য্য সম্পাদন করা যায় না তখন ঐ সকল দেবতার ক্ষমতাতেই যে জীবদেহের কার্য্য সমূহ সম্পাদিত হইতেছে ; তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের মধ্যে কি হইতেছে, আমরা ত তাহার কিছুই জানিনা ; শরীরের কোন কার্য্য আমাদের ক্ষমতার অধীন নহে ; তবে বলুন এমন অত্যাশ্চর্য্যরূপে কে শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতেছে ? বলুন, কে আমাদের ভুক্ত ঘৃতকে মস্তিষ্কে নিয়া মস্তিষ্কের কার্য্য ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতেছে ; কে ঐ চুণ ও ফস্ফরাস নিয়া অস্থি গঠন করিতেছে ; কে ঐ ভুক্ত মৃগনাভিকে নিয়া উপস্থের কার্য্য

ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছে; কে ঐ আর্গটা অর্থাৎ রাইকে সকল শরীর অতিক্রম করিয়া কেবল জরায়ু সঙ্কোচনে ব্যাপৃত করিতেছে; এইরূপে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কে সম্পাদন করিতেছে?

এই সমস্ত কার্য্যই দেবগণ করিতেছেন। একমাত্র সর্ব্ব স্বরূপ পরম পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত থাকিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমি জীবাত্মা পূর্ব্ব জন্মে যে যে দেবতার উপাসনা করিয়াছি সেই সেই দেবতা (পরমাণু প্রভৃতিরূপে) আমাকে অবলম্বন করিয়া আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার অনুসারে ভোগক্ষম দেহ গঠন করিয়াছেন। তাঁহারাই ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবয়বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমার সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমি চোখ ঢাকা বলদের মত তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কার্য্যানুসারে আমি যে দেবতার যে পরিমাণ অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হইয়াছি; আমি ইহ জন্মে অবশ্য তাহা অবলম্বন করিয়া,—আমি বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যতটুকু ক্ষুদ্র, ততটুকু ক্ষুদ্র আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারি। এবার আমি দেবতার অভক্ত হইলেও দেব-প্রদত্ত সেই ক্ষমতা দেবতারা প্রত্যাহার করেন না; কেননা তাহা করিলে ব্রহ্মাণ্ডের একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; কিন্তু আমার ভোগের কাল পূর্ণ হইলে যখন আমি ঐহিক দেহ পরিত্যাগ করিব, তখন আর দেব প্রসাদাৎ সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইব না। (অবশ্য, যে সকল তপস্যার ফল বহু জন্ম ব্যাপী হয়, এস্থলে তাহার

উল্লেখ করা হইল না।) আমি, (জীবাত্মা) নিজ চেষ্টায় নিকটবর্ত্তী উপাদান সমূহকে অবলম্বন করিয়া (কৃমি কীটাদির ন্যায়) এক একটী অকর্ম্মণ্য দেহ ধারণ করিতে পারি বটে, কিন্তু স্বর জন্মে মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ লোক হইতে ইচ্ছা করিলে দেবোপাসনা দ্বারা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই পুরাকালের ঋষি, পরমর্ষি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানিগণ হোমাদি দ্বারা দেবোপাসনা করিতেন। কলির মোহাচ্ছন্ন লোক সমূহ সেই মনীষি-মণ্ডলী সেবিত দেব মহিমা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া দেবোপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকের ভয়ানক কষ্টকে আহ্বান করিতেছে। আশা করি ঢাকাপ্রকাশের পাঠক সময় থাকিতে সাবধান হইবেন।

দেবতা-রহস্য। (৬)

দেব ক্ষমতার কতদূর প্রভাব, তাহা এই কলিকল্মষ সমাবৃত মানব মণ্ডলীর বুঝিবার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়াছে। অন্য পরে কা কথা, যাঁহারা দৈব বলের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারাও দেব মহিমা ও দেবতার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করেন না! "দেব" না বুঝিয়া দৈব বুঝিবার চেষ্টা নিষ্ফল। আগে দেবতা মানিয়া তাহার পরে দৈব মানিতে হইবে। বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতেছেন, মনুষ্যের নিজ ক্ষমতা অতি সামান্য—নাই

বলিলেও চলে। অনেকে হয়ত নিজকে খুব বুদ্ধিমান ও তিনি নিজের বুদ্ধিতেই কাজ করিতেছেন, এরূপ মনে করেন ; কিন্তু বুদ্ধিটাই যে তাঁহার নিজস্ব নহে ; বুদ্ধি তিনি অন্যের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হন ; তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। এই সংসারে মনুষ্য কুলে কোটি কোটি লোক রহিয়াছে, যাহাদিগকে তাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করেন না ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্য আকৃতির সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক নাই ; কেননা তাঁহারা মানব শরীরে যে বুদ্ধি পাইয়াছেন, উহা মানব শরীরের নিত্য ধর্ম্ম হইলে, অন্য কোটি কোটি লোকেও বুদ্ধিমান হইত। বুদ্ধি গঠন করিবার ক্ষমতা যদি কাহারও থাকিত, তবেও বুঝিতাম, তাঁহারা নিজে যখন বুদ্ধিকে গঠন করিয়াছেন, তখন ও জিনিসটা তাঁহাদের নিজেরই। কিন্তু বুদ্ধি কে গঠন করিতে পারিয়াছে ? মনুষ্যের যদি বুদ্ধি গঠন করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে এমন প্রয়োজনীয় জিনিসটাকে ঐ কোটি কোটি লোকেও গঠন করিত। লিখা পড়া শিক্ষাতেও বুদ্ধি গঠন হয় না ; বুদ্ধিব অবলম্বন অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত (গঠিত নহে) হওয়া যায় মাত্র। লিখা পড়া দ্বারা বুদ্ধি গঠন হইলে সমপাঠী সমস্ত ছাত্রই সমান বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন হইত ; সকলেই পাস হইত ; সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে সমান প্রতিপত্তি লাভ করিত।

বুদ্ধি মনুষ্যের স্বাভাবিক নহে ; বুদ্ধি গঠন করা যায় না ; এইরূপ বুদ্ধি ব্যক্তি বিশেষের চিরস্থায়ী সামগ্রীও নহে। তুমি আজ এক কাজে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া গিয়াছ, কিন্তু কাল তুমিই সেই কাজেই একজন নির্ব্বোধ চূড়ামণি বলিয়া পরিচিত হইতেছ। তুমি একাই একদিন বালক বলিয়া অবজ্ঞাত, এক

দিন চালাক চতুর বলিয়া পরিচিত, একদিন ধীমান বলিয়া প্রশংসিত ও একদিন "বুড়া হইয়া ছারে পাইয়াছে" বলিয়া নিন্দিত হইতেছ। বল, তুমি বাল্য কালে যে ছিলা, সেই যদি তুমি যুবত্ব প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য পাইয়া থাক, তবে তোমার বুদ্ধির অবস্থা চারি সময় চারি রকম কেন? বুদ্ধি যদি তোমার নিজস্ব হইত, তবে চিরদিনই তাহাকে তুমি সমানে পরিচালন করিতে পারিতা। তুমি এক অবস্থাতেই কত কারণে বুদ্ধি হারাইতেছ। তুমি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া বুদ্ধি হারাইতেছ, মত্ততা ছুটিয়া গেলেই আবার বুদ্ধি পাইতেছ; তুমি ভয়ে শোকে, পীড়ায়, নানারূপে বুদ্ধি হারাইতেছ, আবার পাইতেছ; নূতন নূতন অভিজ্ঞতা দ্বারা তোমার বুদ্ধির নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। বুদ্ধি তোমার নিজস্ব হইলে তোমার অস্তিত্বের ন্যায় বুদ্ধিও চিরদিন থাকিত, তোমার অনভিমতে তোমার বুদ্ধিটা কখনও চলিয়া যাইতে পারিত না। আবার ইহাও দেখিলাম, কয়েকদিন আহার না করিলেই বুদ্ধি লোপ পায়; আহার করিবার পরে বুদ্ধি আবার গজাইয়া উঠে। অতএব বলিতে হইবে, বুদ্ধিটা তোমাদের নহে; উহা ভুক্ত পদার্থ হইতে তোমরা প্রাপ্ত হও। আমরা যখন দেখিতেছি, মাদকাদি আহার করিলে বুদ্ধির অভাব হয়, তখন স্বীকার করিতে হইতেছে, কতকগুলি পদার্থ হইতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হই, এবং কতকগুলি পদার্থ দ্বারা বুদ্ধি নষ্ট হয়।

বুদ্ধি নিজস্ব নহে; উহা আহার দ্বারা অন্য পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অন্য পদার্থ ত সকলেই আহার করে, তবে সকলের বুদ্ধি না হয় কেন? এস্থলে আমরাও প্রশ্ন করিতে পারি, সকলেই ত আহার করিতেছে, তবে একই

প্রকার আহার করিয়া কেহ মোটা ও কেহ কৃষ হয় কেন? অথবা একই ব্যক্তি একই প্রকার আহার করিয়া কখনও রুগ্ন হয় কেন? মানুষ ত আহার দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়াই খালাস হইতেছে, আহৃত উপাদান গুলিকে নিজের ইচ্ছামত কোন কাজেই লাগাইতে পারে না; যদি জড়প্রকৃতির কার্য্য হইত, তবে একপ্রকার জিনিসের কার্য্য চিরদিনই একপ্রকার হইত; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্য হইত না; বস্তুতঃ যেমন শরীর স্থুল কৃশ, সুস্থ, রুগ্ন প্রভৃতি অন্য কাহারও দ্বারা হইতেছে, তদ্রূপ বুদ্ধিরও নানারূপ পরিবর্ত্তন অন্যকর্ত্তৃক হইতেছে। বুদ্ধির পরিবর্ত্তন—যথাযোগ্যকালে, যথাযোগ্যদেশে, যথাযোগ্য পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটন যে দেবতা দ্বারা হইতেছে, তাঁহার নাম বৃহস্পতি। বুদ্ধির উপাদান জগতে সর্ব্বপ্রকার পদার্থে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং বৃহস্পতি নামক গ্রহবিশেষে অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে, বৃহস্পতি জগতের সমস্ত পদার্থের প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহাতে যখন যে পরিমাণ বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে তাহা প্রকটনা করিতেছেন। এবং জগৎব্যাপী বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি পাত্রবিশেষে স্বতন্ত্র রূপেও কার্য্য করিতেছেন।

আমরা আগামীতে ভগবতী পরমাশক্তির বিশেষ আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিব। সময় সময় যদিও তাঁহাকে বিশেষ রূপে কাজ করিতে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ দেবতারূপেই প্রকটিতা হইতেছেন। তাঁহার দুর্গা কালী প্রভৃতিরূপ শত শত যুগযুগান্তরে ২।১ বার প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তিনি নিত্য জগতের সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছেন দেবতারূপে। তাঁহার জগৎব্যাপী কার্য্যের

সামঞ্জস্য রক্ষার্থ লোকের অদৃষ্টরূপে যে সকল কার্য্য হয় তাহাই দৈবনামে অভিহিত। সাধারণতঃ তিনি বিশেষ বিশেষ দেবতারূপে জগতে আরাধিতা হইয়া থাকেন। দেবতার পূজা ব্যতীত দুর্গা কালী প্রভৃতি রূপেও তাঁহার পূজা হয় বটে, কিন্তু দেবতার পূজা দ্বারা যে সকল ফল স্বভাবতঃ লাভ করা যায়, দুর্গা কালী প্রভৃতির পূজা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারিলে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে সেই ফল লাভের সম্ভাবনা মাত্র। দুর্গা কালী প্রভৃতিরূপে তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে তাঁহার একার পূজাতেই ইন্দ্রোপাসনার ফল স্বরূপ হস্ত ও আধিপত্য, উপেন্দ্রোপাসনার ফল স্বরূপ পদ ও সূর্য্যোপাসনার ফল স্বরূপ চক্ষু প্রভৃতি সকল প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্তু তাঁহার পূজাদ্বারা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ পাইব কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। তিনি সদয় হইলে বিনা তপস্যাতেও অনেককে ধন্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকে লক্ষ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করিয়াও তাঁহার সেই বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে দেবোপাসনার ফল অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করে, সে পরজন্মে নিশ্চয়ই সুচক্ষু প্রাপ্ত হইবে। সে যদি পরজন্মে ঘোরতর পাষণ্ড হইয়াও জন্মগ্রহণ করে, তথাপি সূর্য্যোপাসনার ফল স্বরূপ সুচক্ষু লাভ করিবেই করিবে। অতএব যে ব্যক্তি পরকালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, দেবতা রহস্য অবগত হইয়া দেবোপাসনা করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ।